উজ্জীবন
বার্ষিক পত্রিকা ২০২৬
সিঁথি রামকৃষ্ণ সংঙ্ঘ বিদ্যামন্দির

"জ্ঞান আমাদের ঐক্যের দিকে নিয়ে যায়,
আর অজ্ঞানতা আমাদের পরস্পরের থেকে
আলাদা করে রাখে।"

—শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস

সিঁথি রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ বিদ্যামন্দির (গভঃ স্পনসর্ড)

স্থাপিত ঃ ১৯৫৯

উচ্চমাধ্যমিক

উজ্জীবন

বার্ষিক পত্রিকা ২০২৬

৭৬-বি, কালীচরণ ঘোষ রোড
কোলকাতা - ৭০০ ০৫০
দূরভাষ ঃ ০৩৩২৫৫৬৭৭৪১
মো ঃ ৮৪২০৮৯৭৯২১

শিক্ষাবর্ষ – ২০২৬

ইমেল – **sinthi.srsv@gmail.com**

"মানুষের সহিত মানুষের, অতীতের সহিত বর্তমানের, দূরের সহিত নিকটের অত্যন্ত যোগ, সাধন সাহিত্য ব্যতীত আর কিছুর দ্বারাই সম্ভবপর নহে। যে দেশে সাহিত্যের অভাব, সে দেশের মানুষ সজীব বন্ধনে আবদ্ধ নহে — তারা বিচ্ছিন্ন"।

— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রকাশক ঃ ডঃ দীপঙ্কর ঘোষ (প্রধান শিক্ষক)
সিঁথি রামকৃষ্ণ সংঘ বিদ্যামন্দির

মুদ্রণ ঃ রত্না এন্টারপ্রাইস
২০৯ এম. এন. কে. রোড, কলকাতা - ৭০০ ০৩৫

পত্রিকা সম্পাদক মণ্ডলী

১। ড. দীপঙ্কর ঘোষ (প্রধান শিক্ষক)
২। শ্রী গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায় (সহ শিক্ষক)
৩। ড. নব্যেন্দু প্রামাণিক (সহ শিক্ষক)
৪। শ্রীমতী মালবিকা বিশ্বাস (সহ শিক্ষক)
৫। শ্রী অভীক কুন্ডু (সহ শিক্ষক)
৬। শ্রী সোমনাথ সাধুখাঁ (সহ শিক্ষক)
৭। শ্রী পশুপতি পাল (সহ শিক্ষক)
৮। শ্রী যুবরাজ নস্কর (ছাত্র প্রতিনিধি, দ্বাদশ শ্রেণি)
৯। শ্রী পার্থ পাড়ুই (ছাত্র প্রতিনিধি, একাদশ শ্রেণি)
১০। শ্রী রোহিত ঘোড়ুই (ছাত্র প্রতিনিধি, দশম শ্রেণি)

সম্পাদকের কলমে ...

ছাত্রজীবন এক বিশাল সম্ভাবনার ভান্ডার। আর এই সম্ভাবনাগুলোকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য বিদ্যালয়ের দায়িত্ব অনেক। ছাত্রছাত্রীরা যেমন পাঠ্য বই পড়ে পরীক্ষায় উত্তর লিখতে পারে, পড়ার বই-এর বাইরে স্বাধীনভাবে নিজেদের চিন্তা ও কল্পনাশক্তিকে তেমনি সাজিয়ে-সাজিয়ে গড়ে তুলতে পারে সৃজনশীল জগৎ। নিজেদের বিকশিত জ্ঞান, সংকোচহীন ব্যক্তিত্ব ও প্রখর দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে তারা নির্মাণ করে সাহিত্য ও শিল্পের মঞ্জরী। আর এটা ভীষণভাবে সত্যি যে, শিক্ষার মাধ্যমে কল্পনাশক্তির সদর্থক প্রকাশ না ঘটলে চিন্তাশক্তি স্তিমিত হয়ে যায়। তখন আর কাঙ্ক্ষিত বুদ্ধি ও মেধার যথাযথ বিকাশ ঘটে না।

কৈশোরের সৃজন-সম্ভাবনার মাটিতে আগামীদিনে বৃক্ষ রোপণের জন্য, জলসিঞ্চনের গুরু দায়িত্ব বর্তায় বিদ্যালয়ের ওপরেই। আর সেই উদ্দেশ্য পূরণের জন্য 'উজ্জীবন' এর খোলা পাতায় রঙে-রেখায় আঁকা হয়েছে আমাদের ছাত্রছাত্রীদের মনের আবেগের বিচিত্র সম্ভার। দার্শনিক মার্ক টোয়েন বলেছিলেন— 'যে কোনো আবেগ, যদি তা আন্তরিক হয়, তা স্বতঃস্ফূর্ত'। কথাটা গভীরভাবে বিশ্বাস করি বলে কাগজে-কলমে অনেক কাঁচা লেখাও স্থান পেয়েছে এই পত্রিকায়।

অনেকের লেখা বা আঁকা এবারের 'উজ্জীবন'-এ রাখা গেল না। তাদের সৃষ্টিকে সম্মান জানিয়েই বলছি, আগামীদিনে নিশ্চয়ই তারা সুযোগ পাবে। সকলের আন্তরিক চেষ্টার পরেও কিছু অপূর্ণতা, কিছু ত্রুটি থেকে গেছে। তার জন্য আমরা দুঃখিত। বিদ্যালয়ের পত্রিকাশ প্রকাশ উপলক্ষে সব ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক-অভিভাবিকা এবং শুভানুধ্যায়ীদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই।

“শক্তি হল জীবন, দুর্বলতা হল মৃত্যু। সম্প্রসারণ হল জীবন, সংকোচন হল মৃত্যু। প্রেম হল জীবন, ঘৃণা হল মৃত্যু”।

— স্বামী বিবেকানন্দ

PHONES PBX : (033)
2654-5391 2654-5700
2654-8494 2654-5701
2654-9581 2654-5702
2654-9681 2654-5703
E-MAIL : president@rkmm.org
WEBSITE : www.belurmath.org

RAMAKRISHNA MATH
P.O. BELUR MATH, DIST. HOWRAH
WEST BENGAL : 711 202
INDIA

শুভেচ্ছাবাণী

আমি সিঁথি রামকৃষ্ণ সংঘ বিদ্যামান্দিরকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই, যারা ১৯ মার্চ ২০২৬-এ তাদের বাৎসরিক পত্রিকা 'উজ্জীবন' প্রকাশ করতে চলেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর কৃপায় এই পত্রিকা প্রকাশ অনুষ্ঠান সর্বতোভাবে সফল হোক এবং সিঁথি রামকৃষ্ণ সংঘ বিদ্যামান্দিরের সাথে যুক্ত সকলের জীবনে ভক্তি, পবিত্রতা ও আত্মোন্নতির প্রেরণা জাগ্রত হোক—এই প্রার্থনা করি।

স্বামী গৌতমানন্দ

বেলুড় মঠ
১৬.০২.২০২৬

(স্বামী গৌতমানন্দ)
অধ্যক্ষ
রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন

রামকৃষ্ণ সংঘ বিদ্যামন্দির এর রূপকার
শ্রদ্ধেয় খগেন্দ্র চন্দ্র দে মহাশয়

জন্ম - ১৬ই জানুয়ারি, ১৯০৫ মৃত্যু - ২৫ শে জানুয়ারি, ১৯৮৮

Nabin Baran

Participation in NationalYouth Day Celebration, 12 January 2026 at Belur Math

Participation Students in the Exhibition at Banga Vigyan Mancha-2026

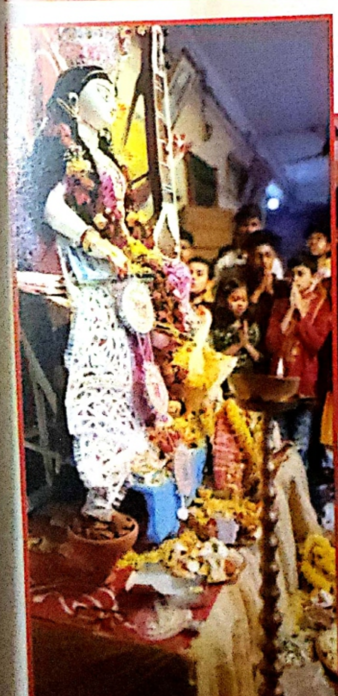

Saraswati Puja - 2026

Independence Day

প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের পক্ষ থেকে ...

পরীক্ষার ফলাফল দিয়েই কেবল একজন ছাত্রকে বিচার করা উচিত নয়—একথাটা বারেবারে প্রমাণিত হয়েছে—অনেক বিখ্যাত মানুষের জীবন অবলম্বন করে। আমাদের বিদ্যালয়ও চেষ্টা করেছে, ছাত্রছাত্রীদের মনের খবর নিতে। কেউ হয়তো বেশি চুপচাপ, কেউ মনে-মনে অনেক কিছু ভাবে, কেউ আবার খুব দুষ্টু, বই-এর চেয়ে কারো মন টানে রং-তুলি—এদের সবার মনের কথাগুলোও তো শোনা দরকার। আর সেই মন-ভরানোর কথা দিয়ে সাজানো হয়েছে 'উজ্জীবন' পত্রিকার এবারের সংখ্যা।

এই পত্রিকা প্রকাশনায় বিদ্যালয়ের অনেকেরই অনেক অবদান আছে। তবে কাজে ত্রুটি এবং ভাবনায় কিছু অপূর্ণতা থেকে গেছে। আমি চেষ্টা করবো, ভবিষ্যতে সেই অসংঙ্গতিগুলো দূর করতে। যাদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় এই পত্রিকা-প্রকাশের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে, তাদের সকলের জন্য অনেক শুভেচ্ছা। আসুন আমরা সবাই মিলে এই পত্রিকাকে এবং ছাত্রছাত্রীদের কল্পনাশক্তিকে, ইচ্ছাশক্তিকে সম্মান জানিয়ে তাদের ভবিষ্যৎকে উজ্জ্বল করে তুলি।

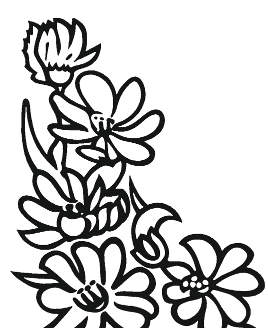

"বই পড়াকে যথার্থ হিসেবে যে সঙ্গী করে নিতে পারে, তার জীবনের দুঃখ কষ্টের বোঝা অনেক কমে যায়"।

— শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

‘‘Education is the manifestation of the Perfection already in man’’

— Swami Vivekananda

বিশেষ কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এই বিদ্যালয়ের প্রাক্তন কৃতি ছাত্র (উচ্চমাধ্যমিক ব্যাচ 1970), বর্তমানে কানাডা প্রবাসী **শ্রীযুক্ত মুকুল প্রামাণিক মহাশয়** এই বিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য আন্তরিক সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা, পরম শ্রদ্ধেয় খগেন্দ্রচন্দ্র দে মহাশয়ের কাছে যথার্থ জীবন-শিক্ষা গ্রহণ করে মুকুলবাবু নিজের জীবনকে ত্যাগ ও সেবার আদর্শে উজ্জীবিত করেছেন। জীবনের দীর্ঘ বছর সরকারের উচ্চ পদে সাফল্যের সঙ্গে কাজ করেছেন উনি। ওনার সহৃদয় সহযোগিতায় বিদ্যালয়-ভবনের পুনর্নির্মাণের কাজ সুসংগঠিত এবং সৌন্দর্যায়িত হয়েছে। বিদ্যালয়ের জন্য একটি ট্রাস্ট গঠন করে পড়াশোনা, খেলাধূলা এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে কৃতি ছাত্রছাত্রীদের নানাভাবে উৎসহিত করে চলেছেন তিনি। এছাড়া প্রতি বছর মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানাধিকারী ছাত্রছাত্রীদের বিশেষভাবে **'মুকুল মেধা পুরস্কার'** প্রদান করে তাদের কৃতিত্বকে আরো উৎসাহিত করে চলেছেন তিনি। ছাত্রছাত্রীদের মানসিক বিকাশের জন্য ওনার অকুণ্ঠ সহযোগিতা সত্যিই আমাদের বিদ্যালয়কে উন্নতির পথে আরও এগিয়ে দিয়েছে।

ঈশ্বরের কাছে ওনার দীর্ঘ এবং নীরোগ জীবন কামনা করি।

শ্রী মুকুল প্রামাণিক মহাশয়কে আমাদের সকলের পক্ষ থেকে বিশেষ শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

বিদ্যালয়ের পক্ষে,
শিক্ষক-শিক্ষিকা, শিক্ষাকর্মী, ছাত্রছাত্রীবৃন্দ

সূচীপত্র

হাতের মুঠোয় দুনিয়া : মোবাইল ফোন — বন্ধু না শত্রু?	প্রবন্ধ	ড. দীপঙ্কর ঘোষ	১০
বীরসন্ন্যাসী	কবিতা	সূর্য সাঁতরা	১৪
কে আমি?	কবিতা	যুবরাজ বসাক	১৫
অঙ্ক কি সত্যিই আতঙ্ক?	প্রবন্ধ	সৌভিক সেন	১৬
স্মৃতি চারণ	কবিতা	সুদেষ্ণা মন্ডল	১৮
স্বামীজীর ক্রমবিকাশবাদ	প্রবন্ধ	শ্রীমতী মালবিকা বিশ্বাস	২০
পথ ও জীবন	কবিতা	পূর্বাশা মন্ডল	২২
শিক্ষামূলক ভ্রমণ (সায়েন্স সিটি)	ভ্রমণ কাহিনি	প্রীতম সরদার	২৩
অজন্তা-ইলোরা ভ্রমণ	ভ্রমণ কাহিনি	অনিরুদ্ধ দাস	২৫
পুরী ভ্রমণ	ভ্রমণ কাহিনি	বিট্টু মন্ডল	২৬
A Day of Mishaps	কবিতা	Sukanta Roy	২৭
বিজ্ঞান ও সামাজিকতা	প্রবন্ধ	ডঃ নব্যেন্দু প্রামাণিক	২৮
কবিতা লিখতে বসার সময়	কবিতা	সুজয় বাগ	৩২
নয়নতারা	গল্প	লিজা খাতুন	৩৩
আমাকে আমার মতো পড়তে দাও	কবিতা	রিকার্য সরকার	৩৫
সে কী স্বপ্ন	কবিতা	প্রিয়ব্রত পাইন	৩৫
কোভিডে এক ঘটনা	গল্প	সংকেত মাইতি	৩৬
অভিনন্দনকে অভিনন্দন	কবিতা	শ্রীমতী মালবিকা বিশ্বাস	৩৮
তিন বন্ধুর হারানো দিন	গল্প	আয়ুষ চক্রবর্তী	৩৯
ঐক্যতান	কবিতা	সুকান্ত রায়	৪১
প্রশান্তির বড়ন্তি	ভ্রমণ কাহিনি	সুনীতা সাহা	৪২
আমাদের বছর	কবিতা	সায়ন পড়্যা	৪৪
শুধু তোমারই জন্য	কবিতা	সমৃদ্ধি দাস	৪৫
একটি ছোট্টো দিনের অভিজ্ঞতা	গল্প	সোনালি আদক	৪৬
ন্যায়বিচার	কবিতা	রৌনক অধিকারী	৪৭

একটি ভ্রমণ কাহিনি	ভ্রমণ কাহিনি	অনীশ বিশ্বাস	৪৮
Bed in Summer	কবিতা	Sourav Das	৪৯
তিন বন্ধু	গল্প	অরিশ হাইত	৫০
স্বপ্ন যাত্রী	কবিতা	সৌভিক সেন	৫১
কাকে বলব জেন জেড	প্রবন্ধ	সোমনাথ সাধুখাঁ	৫২
বৃষ্টি নামুক আকাশ জুড়ে	কবিতা	পশুপতি পাল	৫৬
রাতের কথা	কবিতা	রাজীব জয়সোয়ারা	৫৭
আড্ডা	প্রবন্ধ	সৌক্তিক দাস	৫৮
নববর্ষের প্রার্থনা	কবিতা	শ্রীপরিতোষ বণিক	৫৯
এক অলৌকিক ঘটনা	গল্প	সমুদ্র রায়	৬০
ছোট্ট পুকু	কবিতা	অঙ্কন দাস	৬২
তুলনাহীন আকাশ	কবিতা	মহাদেব ভট্টাচার্য	৬৩
হারানো দিনের সন্ধানে	গল্প	অংশুমান মেয়ুর	৬৪
প্রিয় অভিমান	কবিতা	প্রীতি মন্ডল	৬৫
বাংলার ঋতু	কবিতা	ধ্রুব ঘোড়ই	৬৬
অপেক্ষা	নাটিকা	শুভম দাস	৬৭
মশা	কবিতা	মানব মাইতি	৬৯
বৃষ্টির কথা	কবিতা	কৌস্তভ উকিল	৭০
বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং শিক্ষাকর্মীবৃন্দ			৭১

হাতের মুঠোয় দুনিয়া : মোবাইল ফোন — বন্ধু না শত্রু?

ড. দীপঙ্কর ঘোষ (প্রধান শিক্ষক)

মানুষের সভ্যতা যখন গুহা থেকে বেরিয়ে আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে প্রবেশ করল, তখন চাকা আবিষ্কার ছিল এক বিশাল বিপ্লব। তারপর এল আগুন, বাষ্পীয় ইঞ্জিন এবং বিদ্যুৎ। কিন্তু একুশ শতকে দাঁড়িয়ে যদি প্রশ্ন করা হয়, মানুষের দৈনন্দিন জীবনে সবচেয়ে বড় প্রভাব বিস্তারকারী আবিষ্কার কোনটি? তবে নিঃসন্দেহে এক বাক্যে উত্তর আসবে—'মোবাইল ফোন'। আরও স্পষ্টভাবে বললে, 'স্মার্টফোন'। আজকের দিনে আমাদের ঘুম ভাঙে মোবাইলের অ্যালার্মে, আর রাতে ঘুমাতে যাই মোবাইলের স্ক্রিনে চোখ রেখে। আমাদের পকেটে থাকা এই ছোট্ট যন্ত্রটি আজ আর শুধু কথা বলার মাধ্যম নয়, এটি যেন একটি আস্ত জাদুর-বাক্স। এর মধ্যে পুরে দেওয়া হয়েছে ক্যামেরা, ঘড়ি, ক্যালকুলেটর, টর্চ লাইট, মিউজিক প্লেয়ার, টিভি, খবরের কাগজ, এমনকি আস্ত একটা লাইব্রেরিও। মাত্র কয়েক দশক আগেও মানুষ ভাবতেই পারত না যে, তার হাতের মুঠোয় পুরো পৃথিবীটা চলে আসবে। কিন্তু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির আশীর্বাদে আজ তা সম্ভব হয়েছে। আজকের ছাত্রছাত্রীদের কাছে এই যন্ত্রটি যেমন অসীম জ্ঞানের দরজা খুলে দিয়েছে, তেমনি এর অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার তাদের ঠেলে দিচ্ছে এক গভীর অন্ধকারের দিকে। তাই আজ খুব জরুরি হয়ে পড়েছে এটা বিচার করা যে, মোবাইল ফোন আসলে আমাদের বন্ধু, নাকি ছদ্মবেশী শত্রু।

মোবাইল ফোনের ইতিবাচক দিকগুলো নিয়ে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই আসে শিক্ষার কথা। একটা সময় ছিল যখন কোনো অজানা বিষয় জানতে হলে ছাত্রছাত্রীদের মাইলের পর মাইল হেঁটে লাইব্রেরিতে যেতে হতো, মোটা মোটা এনসাইক্লোপিডিয়া বা অভিধান ঘাঁটতে হতো। কিন্তু আজ, ইন্টারনেটের কল্যাণে পৃথিবীর যাবতীয় তথ্য গুগল বা উইকিপিডিয়ার মাধ্যমে চোখের পলকে আমাদের সামনে হাজির হয়। বিজ্ঞানের জটিল সূত্র হোক কিংবা ইতিহাসের কোনো সাল-তারিখ, ভূগোলের মানচিত্র হোক কিংবা ইংরেজি ব্যাকরণ—সব কিছুই এখন এক ক্লিকে পাওয়া যায়। বিশেষ করে করোনা মহামারীর সময় যখন স্কুল-কলেজ সব বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তখন এই মোবাইল ফোনই ছিল পড়াশোনার একমাত্র লাইফলাইন। যদি স্মার্টফোন না থাকত, তবে কোটি কোটি ছাত্রছাত্রীর শিক্ষাজীবন স্থবির হয়ে পড়ত। জুম বা গুগল মিটের মতো অ্যাপ ব্যবহার করে শিক্ষকরা ঘরে বসেই ক্লাস নিয়েছেন, ছাত্ররা তাদের পড়া তৈরি করেছে। এর বাইরেও ইউটিউবে হাজার হাজার শিক্ষামূলক চ্যানেল আছে, যেখানে বিশ্বের সেরা শিক্ষকরা বিনামূল্যে অঙ্ক, বিজ্ঞান, ইংরেজি, শেখাচ্ছেন।

শুধু পুঁথিগত বিদ্যা নয়, সৃজনশীলতা বা নতুন কিন্তু শেখার ক্ষেত্রেও মোবাইল এক অনন্য সঙ্গী। আগে ছবি আঁকা শিখতে হলে আঁকার স্কুলে ভর্তি হতো, গিটার শিখতে হলে গুরু খুঁজতে হতো। এখন ইউটিউব বা বিভিন্ন টিউটোরিয়াল অ্যাপ দেখে ছাত্রছাত্রীরা ঘরে বসেই দারুণ ছবি আঁকছে। গান শিখছে, এমনকি নতুন নতুন ভাষা শিখছে। অনেকে মোবাইলের ক্যামেরা ব্যবহার করে ফটোগ্রাফি শিখছে, ভিডিও এডিট করে নিজেদের সৃজনশীলতা প্রকাশ করছে। কোডিং বা প্রোগ্রামিং—যা ভবিষ্যতের জন্য খুব জরুরি—তাও এখন মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে শেখা সম্ভব। এছাড়া যোগাযোগ ব্যবস্থায় মোবাইল ফোন এক বিপ্লব

এনেছে। হোস্টেলে থাকা ছেলেটি যখন বাড়ির কথা মনে করে মন খারাপ করে, তখন ভিডিও কলে কাছের মানুষের মুখ দেখে তার সব কষ্ট দূর হয়ে যায়। রাস্তায় কোনো বিপদে পড়লে এক ক্লিকেই বাবা-মা বা পুলিশকে লোকেশন পাঠানো যায়। এই নিরাপত্তা ও মানসিক শান্তির জায়গাটি মোবাইল ফোন খুব সহজ করে দিয়েছে।

কিন্তু মুদ্রার যেমন এপিঠ-ওপিঠ থাকে, মোবাইলেরও তেমনি একটি অন্ধকার দিক আছে। আর উদ্বেগের বিষয় হলো, আজকের তরুণ প্রজন্ম এবং ছাত্রছাত্রীরা এই অন্ধকারের দিকেই বেশি ঝুঁকছে। মোবাইল ফোনের ব্যবহার যখন প্রয়োজনে সীমাবদ্ধ না থেকে নেশায় পরিণত হয়, তখনই শুরু হয় সমস্যা। বিজ্ঞানীরা একে বলছেন 'ডিজিটাল কোকেন'। ড্রাগ বা নেশা করলে মস্তিষ্কে যেমন এধরণের রাসায়নিক পরিবর্তন হয়, অতিরিক্ত মোবাইল আসক্তিও মস্তিষ্কে ঠিক একই রকম প্রভাব ফেলে। এর প্রথম ও প্রধান শিকার হচ্ছে ছাত্রছাত্রীদের মনোযোগ। পড়াশোনা বা যে কোনো কাজে সফল হওয়ার মূল চাবিকাঠি হলো একাগ্রতা বা মনোযোগ। কিন্তু মোবাইল ফোন এই মনোযোগের সবচেয়ে বড় শত্রু। পড়তে বসে ছাত্ররা পাশে ফোন রাখে। প্রতি পাঁচ মিনিট অন্তর টুং করে নোটিফিকেশন বাজে—হয়তো ফেসবুকের লাইক, নয়তো হোয়াটসঅ্যাপের মেসেজ। পড়ার মাঝখানে একবার ফোন হাতে নিলে কখন যে এক ঘন্টা কেটে যায়, তা টেরই পাওয়া যায় না। মস্তিষ্কের এই বারবার মনোযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে কোনো কিছুই গভীরভাবে শেখা সম্ভব হয় না। একে বলা হয় 'মাল্টিটাস্কিং'-এর কুফল। মনে হয় অনেক কাজ করছি, কিন্তু আসলে কোনো কাজই ঠিকমতো হয় না। ফলে পরীক্ষার রেজাল্ট খারাপ হতে থাকে এবং ছাত্ররা হতাশায় ভোগে।

শারীরিক স্বাস্থ্যের ওপর মোবাইলের কুপ্রভাব আজ এক ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। মানবদেহ তৈরি হয়েছে চলাফেরা ও পরিশ্রম করার জন্য, কিন্তু মোবাইল আমাদের স্থবির করে দিয়েছে। আগে বিকেল হলেই পাড়ার মাঠগুলো বাচ্ছাদের কলরবে মুখর থাকত। ক্রিকেট, ফুটবল বা গোল্লাছুটের মতো খেলায় শরীর থেকে ঘাম ঝরত, হাড় ও পেশি মজবুত হতো। আজ মাঠগুলো খাঁ খাঁ করছে। বাচ্ছারা এখন সোফায় বা বিছানায় শুয়ে শুয়ে মোবাইলে ফ্রি ফায়ার, পাবজি বা অন্যান্য ভিডিও গেম খেলছে। ঘন্টার পর ঘন্টা ঘাড় নিচু করে স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে থাকার ফলে খুব অল্প বয়সেই মেরুদন্ডের সমস্যা, ঘাড়ে ব্যথা (যাকে ডাক্তাররা 'টেক্সট নেক' সিনড্রোম বলছেন) এবং পিঠের ব্যথা দেখা দিচ্ছে। এছাড়া চোখের ক্ষতি তো আছে। মোবাইলের স্ক্রিন থেকে যে নীল আলো (Blue LIght) বের হয়, তা চোখের রেটিনার ক্ষতি করে এবং দৃষ্টিশক্তি কমিয়ে দেয়। অনেক ছোট বাচ্চার চোখে এখন ভারী পাওয়ারের চশমা। আর একটি বড় সমস্যা হলো ঘুমের ব্যাঘাত। আমাদের শরীরে মেলাটোনিন নামে একটি হরমোন আছে যা আমাদের ঘুম পাড়াতে সাহায্য করে। কিন্তু রাতে ঘুমানোর আগে মোবাইল ব্যবহার করলে স্ক্রিনের আলো এই হরমোন তৈরিতে বাধা দেয়। ফলে গভীর ঘুম হয় না, বা অনিদ্রা দেখা দেয়। পর্যাপ্ত ঘুম না হলে পরদিন শরীরে ক্লান্তি থাকে, মেজাজ খিটখিটে হয়ে যায় এবং ক্লাসে কিছুতেই মনোযোগ দেওয়া যায় না। দীর্ঘমেয়াদে এটি স্থূলতা বা ওবেসিটি এবং হার্টের সমস্যার ঝুঁকিও বাড়িয়ে দেয়।

মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর মোবাইলের প্রভাব আরও গভীর এবং জটিল। সোশ্যাল মিডিয়া—যেমন ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, স্ন্যাপচ্যাট—তরুণদের মনের ওপর এক ধরণের অদৃশ্য চাপ তৈরি করে। এখানে সবাই তাদের জীবনের সেরা মুহূর্তগুলোর ছবি দেয়—কোথাও ঘুরতে যাওয়া, দামি উপহার পাওয়া বা রেস্টুরেন্টে

খাওয়ার ছবি। সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের মনে হীনমন্যতা তৈরি হয়। তারা ভাবতে শুরু করে, "ওর জীবন কত সুন্দর, আর আমার জীবন কত পানসে!" এই তুলনা করার প্রবণতা বা 'Comparison Culture' তাদের মনে ডিপ্রেশন বা বিষন্নতা জন্ম দেয়। এছাড়া 'ফোমো' (FOMO – Fear of Missing Out) বা পিছিয়ে পড়ার ভয় তাদের সবসময় তটস্থ রাখে। সবসময় মনে হয়, এই বুঝি কোনো আপডেট মিস করলাম, এই বুঝি বন্ধুরা আমাকে ছাড়াই মজা করছে। এই অস্থিরতা তাদের শান্তিতে থাকতে দেয় না। টিকটক বা রিলস-এর মতো ছোট ভিডিওগুলো দেখার নেশা বা 'স্ক্রলিং অ্যাডিকশন' মানুষের ধৈর্যশক্তি কমিয়ে দিচ্ছে। ১৫ সেকেন্ডের ভিডিও দেখতে অভ্যস্ত মস্তিষ্ক এখন আর ১৫ পাতার বই পড়ার ধৈর্য রাখে না। কোনো কিছুতেই বেশিক্ষণ মনোযোগ ধরে রাখার ক্ষমতা বা 'অ্যাটেনশন স্প্যান' আজ আশঙ্কাজনকভাবে কমে গেছে। এর ফলে গভীর চিন্তা বা সৃজনশীল কিছু ভাবার ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

সামাজিক সম্পর্ক ও পারিবারিক বন্ধনের ক্ষেত্রেও মোবাইল এক বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আগে পরিবারের সবাই রাতে একসাথে খেতে বসে গল্প করত, সারাদিন কে কী করল তা নিয়ে আড্ডা হতো। এখন ডাইনিং টেবিলে বসেও সবাই যার যার মোবাইলে ব্যস্ত। পাশে বসে থাকা মানুষটির সাথে কথা না বলে তারা ফেসবুকে অচেনা মানুষের পোস্টে কমেন্ট করতে বেশি আগ্রহী। একে বলা হচ্ছে 'ফাবিং' (Phubbing)—অর্থাৎ ফোন ব্যবহার করার জন্য কাছের মানুষকে অবজ্ঞা করা। এর ফলে বাবা-মায়ের সাথে সন্তানদের দূরত্ব বাড়ছে, ভাই-বোনের মধ্যে খুনসুটি কমে যাচ্ছে। বাচ্চারা ধীরে ধীরে অসামাজিক ও একলষেঁড়ে হয়ে পড়ছে। তারা মানুষের মুখের ভাষা বা ইশারা বোঝার চেয়ে ইমোজির ভাষা ভালো বোঝে, যা ভবিষ্যতে তাদের ব্যক্তিগত ও কর্মজীবনে সম্পর্কের ক্ষেত্রে বড় সমস্যা তৈরি করতে পারে। সামনাসামনি কথা বলতে গেলে তারা জড়তা অনুভব করে, আত্মবিশ্বাসের অভাবে ভোগে।

ইন্টারনেটের এই বিশাল জগতে নিরাপত্তা বা সাইবার ক্রাইম একটি বড় উদ্বেগের বিষয়। ছাত্রছাত্রীরা অনেক সময় না বুঝেই ব্যক্তিগত তথ্য বা ছবি অনলাইনে শেয়ার করে ফলে, যা হ্যাকার বা খারাপ মানুষের হাতে পড়লে বড় বিপদ হতে পারে। সাইবার বুলিং বা অনলাইনে হেনস্থা করার ঘটনা এখন অহরহ ঘটছে। ক্লাসের কোনো বন্ধুকে নিয়ে ট্রল করা বা বাজে মন্তব্য করা—এগুলো ভুক্তভোগীর মনে গভীর ক্ষত সৃষ্টি করে, যা তাকে আত্মহত্যার দিকেও ঠেলে দিতে পারে। এছাড়া ইন্টারনেটে এমন অনেক বিষয়বস্তু বা কন্টেন্ট আছে যা শিশুদের জন্য অনুপযুক্ত। সহিংস ভিডিওর সহজলভ্যতা শিশুদের কোমল মনকে বিকৃত করে দিচ্ছে। তারা এমন এক জগতে প্রবেশ করছে যার জন্য তারা মানসিকভাবে প্রস্তুত নয়। অনেক সময় অনলাইন গেমিং-এর চক্করে পড়ে তারা বাবা-মায়ের ক্রেডিট কার্ড থেকে হাজার হাজার টাকা খরচ করে ফেলে, যা পরিবারের জন্য বড় আর্থিক ক্ষতির কারণ হয়।

এখন প্রশ্ন হলো, এই সমস্যা থেকে মুক্তির উপায় কী? মোবাইল ফোনকে কি আমরা ছুঁড়ে ফেলে দেব? না, তা সম্ভব নয়। কারণ বর্তমান যুগে প্রযুক্তির সাথে তাল মিলিয়ে না চললে আমরা পিছিয়ে পড়ব। মোবাইল ফোন নিজেই সমস্যা নয়, সমস্যা হলো এর ব্যবহারের ধরণ। আমাদের শিখতে হবে কীভাবে একে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এর জন্য সবার আগে প্রয়োজন সচেতনতা এবং আত্মনিয়ন্ত্রণ। ছাত্রছাত্রীদের বুঝতে হবে যে মোবাইল একটি যন্ত্র মাত্র, এটি আমাদের ব্যবহারের জন্য তৈরি হয়েছে। নিজেকে প্রশ্ন করতে হবে—'আমি কি মোবাইল চালাচ্ছি, নাকি মোবাইল আমাকে চালাচ্ছে?'

প্রথমত, ছাত্রছাত্রীদের জন্য একটি ডিজিটাল রুটিন তৈরি করা খুব জরুরি। দিনের ২৪ ঘন্টার মধ্যে মোবাইল ব্যবহারে জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় বরাদ্দ রাখতে হবে। যেমন, দিনে এক বা দেড় ঘন্টার বেশি বিনোদনের জন্য মোবাইল ব্যবহার করা যাবে না। বাকি সময়টা পড়াশোনা, খেলাধুলা বা পরিবারের সঙ্গে কাটাতে হবে। দ্বিতীয়ত, 'নো ফোন জোন' বা মোবাইলমুক্ত এলাকা তৈরি করতে হবে। যেমন— খাবার টেবিল, পড়ার ঘর এবং শোবার ঘরে মোবাইল নিষিদ্ধ করা যেতে পারে। বিশেষ করে রাতে ঘুমানোর অন্তত এক ঘন্টা আগে মোবাইল ফোন থেকে দূরে থাকা উচিত। এতে ঘুমের মান ভালো হবে এবং মস্তিষ্ক বিশ্রাম পাবে। পড়ার সময় মোবাইল ফোন অন্য ঘরে রেখে আসা বা 'ডু নট ডিস্টার্ব' মোড চালু রাখা উচিত, যাতে মনোযোগ নষ্ট না হয়।

অভিভাবকদের ভূমিকা এখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। বাচ্চারা তাদের বাবা-মাকে দেখেই শেখে। বাবা-মা যদি সারাদিন মোবাইলে মুখ গুঁজে থাকেন, তবে সন্তানকে বারণ করার নৈতিক অধিকার তাদের থাকে না। এই অভিভাবকদেরও মোবাইল ব্যবহার কমাতে হবে এবং সন্তানদের সাথে গুণগত সময় কাটাতে হবে। ছুটির দিনে তাদের নিয়ে পার্কে যাওয়া, বই পড়ে শোনানো বা ইনডোর গেম খেলা—এতে বাচ্চারা মোবাইলের প্রতি আকর্ষণ হারাবে। স্কুলগুলোতেও মোবাইল ব্যবহারের কুফল সম্পর্কে সচেতনতামূলক ক্লাস নেওয়া উচিত। সাইবার নিরাপত্তা, সঠিক ইন্টারনেট ব্যবহার এবং সময়ের মূল্য সম্পকের্র ছাত্রদের জ্ঞান দেওয়া জরুরি।

এছাড়া আমাদের বাস্তব জগতকে ভালোবাসতে শিখতে হবে। মোবাইলের স্ক্রিনের কৃত্রিম আলোর চেয়ে বাইরের সকালের রোদ অনেক বেশি সুন্দর। ভার্চুয়াল গেমের চেয়ে বন্ধুদের সাথে মাঠে ফুটবল খেলার আনন্দ অনেক বেশি। লাইকের সংখ্যার চেয়ে সত্যিকারের বন্ধুর আলিঙ্গন অনেক বেশি তৃপ্তিদায়ক। বই পড়ার অভ্যাস ফিরিয়ে আনতে হবে। বই মানুষের কল্পনাশক্তি বাড়ায়, যা কোনো ভিডিও বা সিনেমা পারে না। প্রকৃতির সাথে সময় কাটানো, গাছ লাগানো, পোষা প্রাণীর যত্ন নেওয়া—এসব কাজ শিশুদের মানসিক বিকাশে সাহায্য করে এবং মোবাইলের আসক্তি কমায়।

উপসংহারে বলা যায়, 'বিজ্ঞান আমাদের দিয়েছে বেগ, কিন্তু কেড়ে নিয়েছে আবেগ'—এই কথাটি যেন আমাদের জীবনে সত্যি না হয়। মোবাইল ফোন মানুষের আবিষ্কৃত অন্যতম সেরা প্রযুক্তি, কিন্তু এটি একটি দ্বিমুখী তলোয়ার। সঠিক হাতে এটি জ্ঞান ও প্রগতির চাবিকাঠি, আর ভুল হাতে এটি ধ্বংসের হাতিয়ার। আমরা যেন প্রযুক্তির দাস না হই, বরং প্রযুক্তিকে আমাদের প্রভু হিসেবে নয়, ভৃত্য হিসেবে ব্যবহার করি। ছুরি দিয়ে যেমন জীবন বাঁচানোর জন্য অপারেশন করা যায়, আবার মানুষ খুনও করা যায়—তেমনি মোবাইল দিয়ে বিশ্বজয় করা যায়, আবার নিজের জীবন ধ্বংসও করা যায়। পছন্দটা আমাদেরই করতে হবে।

প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা, তোমরাই আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। এই দেশ ও পৃথিবী গড়ার দায়িত্ব তোমাদের কাঁধে। তোমাদের মেধা ও সময় মোবাইলের স্ক্রিনে স্ক্রল করে নষ্ট করার জন্য নয়। প্রযুক্তির বিশাল শক্তিকে কাজে লাগিয়ে তোমাদের নিজেদের ও সমাজের উন্নতি করতে হবে। এসো, আমরা প্রতিজ্ঞা করি—আমরা যন্ত্রের কাছে হার মানব না। আমরা জীবনের আসল সৌন্দর্য উপভোগ করব, বন্ধুদের সাথে প্রাণ খুলে হাসব, পরিবারের পাশে থাকব এবং মোবাইল ফোনকে শুধু প্রয়োজনে ব্যবহার করে একটি সুন্দর, সুস্থ ও সচেতন জীবন গড়ে তুলব। মনে রেখো, জীবনটা মোবাইলের ৬ ইঞ্চি স্ক্রিনের চেয়ে অনেক অনেক বড়, এবং বাস্তবের পৃথিবীটা ফিল্টার করা ছবির চেয়েও অনেক বেশি রঙিন।

বীরসন্ন্যাসী

সূর্য সাঁতরা
নবম শ্রেণি, ক-বিভাগ, ক্রমিক সংখ্যা-40

সপ্তর্ষিমন্ডল মাঝে ধ্যানমগ্ন ঋষি
প্রণাম লহ ভাবী ভারতের সেই বীরসন্ন্যাসী।।
গৈরিক ধারী অগ্নশিখা তেজোদৃপ্ত বদন
পথ দেখাও সেই আলোকের যেথায় শান্ত সদন।।
পথভ্রষ্ঠ ভারতবর্ষে পথ দেখালে তুমি
পথ প্রদর্শক তোমায় সর্বদাই যে নমি।
ব্যর্থতার সান্ত্বনা তুমি, হতাশার তুমি আশা,
তোমার পায়ে সমর্পিলাম সকল ভালোবাসা।।
যুগনায়ক হলে তুমিই, হৃদয়ে তোমার অনল
ভালোবাসায় ভরো তুমি মানব হৃদয় মহল।।
তুমিই চেনালে সেই সত্য যাহা মৃত্যুরূপা।।
জানাইলে তুমি সবার উপরে হল শুধু মানবতা।।
দুরে ফেলে দাও পুজোর ডালা বুভুক্ষু চায় দুমুঠো ভাত
ভেঙে ফেলো লৌহপিন্ড, বাড়াও সেবার হাত।।
অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হও, জেগে ওঠো, হও প্রাণময়
ভেঙে ফেলো সব অচলায়তন, ভুলে যাও যত ভয়।।
তোমা হতে শিখেছি মন্ত্র শিবজ্ঞানে জীব সেবায়
রামকৃষ্ণ মন্ত্র তুমি করিলে প্রচার।।
ধর্মাধর্ম ভুলে গিয়ে আসল মানুষ হয়ে ওঠো
ভুলে যাও সঙ্কীর্ণতা, মানবতার মন্ত্র শেখো
আল্লা, ঈশ্বরে তুমি স্থাপিলে একই মূর্তিতে।।
আমেরিকার হৃদয় জয় করলে যে যুক্তিতে
প্রেমের বাণী প্রচার করিলে সকল মানুষ মাঝে
যা আজও হৃদয়েতে অক্ষত রূপে রাজে।।
ধর্মাধর্মের মহাবৃত্ত গড়িলে যাহা তুমি।
আজও তাহার প্রহরীতে ওগো বিবেকানন্দ স্বামী।।
শ্রীরামকৃষ্ণ মন্ত্রে হলে অশেষ সমাধিতে লীন।
আজও তোমায় স্মরি মোরা হিন্দু ও মুসলিম।।

কে আমি?

যুবরাজ বসাক

একাদশ শ্রেণি, আর্টস-বিভাগ, ক্রমিক সংখ্যা-4

আমি কে? — প্রশ্নটা মাথা থেকে সরে না,
চেনা মুখটাও আয়নাতে আর নিজের মতো লাগে না।
সব কথাই আছে ঠোঁটে, তবুও কিছুই বলে না,
অমি কি কেবলই এক ছায়া, যে নিজেকেই ছুঁতে পারে না।

আমি এক পুতুল — যে নাটকের বাইরে,
হাত-পা কিছুই নাড়াই না, সবই অভ্যন্তরে।
দর্শক তো নেই, তবুও অভিনয় করি,
হাসি ফোটাই মুখে, আর ভিতরে তে ঝরি।

আমি এক কণ্ঠ — কিন্তু ভাষাটা নিঃশব্দ।
বলতে চাই অনেক, কিন্তু হৃদয়টাই স্তব্ধ।
আমার শব্দেরা সব দেওয়াল ছুঁয়ে মরে,
আমি একাই শুনি, কারন আর কেউ নেই ঘরে।

আমার বুক বেয়ে পেরিয়েছে কত চেনা ছায়া,
কেউই দাঁড়ায় না, সবাই ব্যস্ত এক মায়া,
আমি থাকি পাশে — নেই সত্তা, নেই নাম,
শুধু একটা আশা যে, কেউ দেবে আমার দাম।

আমি এক সাগর — নেই ঢেউ নেই ভাটা,
ভিতরে গুমরে আছে না বলা কথাটা।
কিন্তু আমি জানি — আমি সেই গভীরতা,
যেখানে নিজেকেই চিনতে ভুল করে নিজস্বতা।

অঙ্ক কি সত্যিই আতঙ্ক?

সৌভিক সেন
দশম শ্রেণি, খ-বিভাগ, ক্রমিক সংখ্যা-39

প্রথমত, গণিত জিনিসটা ঠিক কি এই উত্তর খুঁজতে গেলে অনেকের অনেক মতামত। 'আট থেকে আশি অংক ভালোবাসি' অথবা 'শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা অঙ্কই হল ভরসা' এটা সত্য নাও হতে পারে। কারণ অংক অনেকের কাছে আজগুবি জিনিস, আবার কারোর কাছে এই অঙ্কই ভূতের সমান। ছোটোদের কাছে আবার জুজু। আবার অংক প্রেমীদের কাছে তা কয়েকটা সংখ্যামাত্র বা equation। অনেকের কাছে অংক আবার ভালোবাসা, তারাই হল আসল অংকপ্রেমী। এই অংক বিষয়টি আমরা যত জটিল মনে করি ততটা জটিল নয় এটা। অঙ্ক হল এমন একটি মাধ্যম যেখানে জ্ঞানের সাথে সাথে বুদ্ধির অনেক দরকারও বটে। তাই, এই অংকটা আসলে কী এবং equation জিনিসটা কী বলতে Sir শ্রীনিবাস রামানুজন (ভারতীয় প্রখ্যাত গণিতবিদ) বলেছিলেন, ''An Equation for me has no meaning unless it enquiries a thought of God''। এবারে তাহলে তোমরা বলবে গণিতের সাথে ঈশ্বরচর্চা এটা কখনো সম্ভবই হতে পারে না। আজ্ঞে না, একটা সহজ উদাহরণ দিয়ে বোঝাই তবে, একবার পাশ্চাত্যে স্বামীজির সাথে দেখা হয় নিকোলা টেসলার যিনি ছিলেন একজন অভিজ্ঞ বিজ্ঞানী। তিনি তার গবেষণা নিয়ে স্বামীজির সাথে আলোচনা করলে তিনি তার আধ্যাত্ম ভাবনার একটা উত্তর দেন। তার সারমর্ম হল, সমস্ত শক্তি তা নিজের অন্তরের, বা দেহের বা শরীরের, নষ্ট হলেও তা অপর শক্তিতে পরিণত হয়। এই Mass নিয়ে টেসলা কাজ করলেও তার মৃত্যুর পর সেই কাজটি থমকে থাকলেও দশ বছর পর সেটি প্রমাণ করেন স্যার অ্যালবার্ট আইনস্টাইন (Energy cannot be created and destroyed)। অর্থাৎ আমাদের যে ভাবনা ঈশ্বরচর্চা এবং বিজ্ঞানচর্চা দুটি ভিন্ন পথে যেটি এনারা অনেকটা হলেও ভুল প্রমাণ করে দিয়েছেন। আমাদের আধুনিক জগতে একটা অন্ধ বিশ্বাস আছে ছোটোদের মধ্যে যে বেদ বেদান্ত সবই বৈজ্ঞানিক নয়, এটা কয়েকটা myth। কিন্তু তা সত্য নয়। এমন বিদেশে বহু বৈজ্ঞানিক কাজকর্ম চলছে এই বেদান্তর ওপরে। জার্মানিতে একটি বিশেষ class এর আয়োজন করা হয়। School গুলোতে যেখানে সংস্কৃত পড়ানো হয় তাহলে আমরাই কেন পিছিয়ে থাকবো? আমরাই কেন নিজেদের সংস্কৃতি, নিজেদের বিজ্ঞানকে ছোট করবো? শূন্যের আবিষ্কার আমরাই দেখিয়েছি। 'বোসন কণা' জগৎকে জানিয়েছি আমরাই। এই উন্নতশীল দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনী 5G Network-এর মূল ভিত্তিটা আমরাই গড়েছি। সবকিছুর মূলেই হয়েছে অঙ্ক। তবুও অঙ্ক বলতে দু-চারটে ছোট ছোট প্রশ্ন সমাধান করাই আমরা বুঝি। আমরাই অঙ্ক পারলেই আনন্দে লাফিয়ে পড়ি আবার না পারলে বলেছি, 'অঙ্ক করতে পারি না'। এই ভাবনা আমাদের বদলাতে হবে। দশকে শূন্য দিয়ে ভাগ করলে অনেকেই উত্তর দেয় যে এটার Answer শূন্য হবে, কিন্তু এটার যে কোনো উত্তর নেই তা আমরা ভুল করে ফেলি। আমরা পুঁথিগত শিক্ষায় বাঁধা জগতের বাইরে গিয়ে জানতে চেষ্টা করি না। আসলে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা আমাদেরকে এতটাই বেঁধে দিয়েছে যে আমরা এর চেনা নদীর বাইরে বেরোতে পারি না। আমরা নিজেরা ভাবতে, কল্পনা করতে ভুলে গেছি। একটা জিনিস আমরা খেয়াল করি, জন্ম থেকে মৃত্যু

কী মৃত্যুর পর এমন এর বাৎসরিক কাজ পর্যন্ত অঙ্ক লাগে, সেটা কীভাবে? জন্মের সময় কখন জন্মাল, কতদিন পর জন্মাল ইত্যাদি এবং বাৎসরিক কাজে হিসাব নিকাশেও অঙ্ক লাগে। অঙ্ক বলতে আমরা IIT Level কে বেশি প্রাধান্য দিই। কিন্তু, এটা ভাবি না IIT না পড়ে কি অঙ্ক হয় না? তাই আমাদের উচিত চেনা গন্ডী থেকে বেরিয়ে অনেক কিছু ভাবনা চিন্তা করা, জগৎকে নিয়ে ভাবা, জগতের গঠন, আমাদের অস্তিত্ব—এই সব নিয়ে চিন্তাভাবনা করা। তাহলেই দেখবে কোনো পরীক্ষায় কম হলেও আর দুঃখ হবে না। আইনস্টাইনও তার Admission Test-এ Fail করেছিলেন, তাই অংক জিনিসটাকে আমাদের ভালো বাসতে হবে। এই অংক ছাড়া জীবন অচল। অনেক ভৌতবিজ্ঞান শিক্ষক আমার এই গল্পটি পড়ছেন। তারা জানেন এবং ভাবেন ভৌতবিজ্ঞান বা Physics অঙ্কেরও ওপরে। তাই আমরা একটি প্রশ্ন তাদের জন্য। এখন পর্যন্ত চারটি Dimension আবিষ্কৃত হয়েছে, যথা দৈর্ঘ্য, দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ, দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও উচ্চতা, সময়। কিন্তু, অঙ্কে আমরা 'n' Dimension পর্যন্ত বার করতে পারি। তাই অঙ্ক আমাদের উন্নতি দিয়েছে। অঙ্ক তথা সবকিছুই এবং ভৌতবিজ্ঞান ও জীবনবিজ্ঞানও এর সাথে ওতপ্রোত ভাবে যুক্ত। তাই সবাইকে একান্ত অনুরোধ যারা বড়ো হয়ে কিছু হতে চাও, তারা পড়াশোনা করতে শুরু করে দাও। এবার প্রশ্ন, আমরা তাহলে প্রতিদিন কি করছি? এটার উত্তর তো ছাত্ররা ভালোই বলতে পারবে। তাই কিছু না আরও ভালো পড়ো।

"যখন আমি পিছনে ফিরে তাকাই, তখন সাহিত্যের জীবনদায়ী শক্তিতে আমি আবারও মুগ্ধ হই। যদি আমি একজন তরুণ হতাম, পৃথিবীতে নিজেকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করতাম, তাহলে আমি আবারও পড়তাম, ঠিক যেমন আমি ছোটবেলায় করতাম"।

— মায়া অ্যাঞ্জেলো

স্মৃতি চারণ

সুদেষ্ণা মন্ডল
দ্বাদশ শ্রেণি, বিজ্ঞান-বিভাগ, ক্রমিক সংখ্যা-41

মনে পড়ে সেই প্রথম দিন
বিদ্যালয়ে আসা
তখন ছিলাম ছোট্ট ছানা
ভয় ছিল ভাসা ভাসা।
স্কুল দরজায় পা রেখে মোর
শুরু হল পথ চলা
মন-জমানো হাজারো স্মৃতি
যাবে না যে কখনো ফেলা।
প্রার্থনা করতে মাঠে
লাইন দিতাম এসে
বিরক্তিকর স্কুল জীবনকে
নিলাম ভালোবেসে।
ক্লাস রুমেতে পড়ার প্রতি
মন ছিল খুব অল্প
সবাই মিলে সুযোগ খুঁজতাম
কখন করবো গল্প।
গল্পের ছিল বাহারি রূপ
নানা রকম ছন্দ
শিক্ষকদের মজার নাম
দেওয়াটা নয় মন্দ।
বেঞ্চের উপর বই রেখে
চলত অনেক হাসি
পাছে শিক্ষক দেখতে পেলে
হয়ে যেতে পারে ফাঁসি।
নিজের টিফিন ছেড়ে দিয়ে
বন্ধুর টিফিন খেতাম।

ছোটবেলার দিনগুলো যদি
আবারো ফিরে পেতাম।
সময় কখনো থেমে থাকে না
এগিয়ে সে যে চলে।
তার তালে তালে আমিও চলেছি
একাদশকে পিছনে ফেলে।
বর্তমানে আমি এখন দ্বাদশ
শ্রেণিতে পড়ি
মাথার উপর কত দায়িত্ব
কী করে যে পালন করি?
সামনে আমার বোর্ড পরীক্ষা
পড়তে হবে অনেক
কিন্তু বই দেখলে মন যে পালায়
সে অনেক চিন্তায় রত
এই তো আর কটা দিন
স্কুল জীবনের বাকি
এত বছর ধরে আমি
ভালোই দিয়েছি ফাঁকি।
বেঞ্চে জায়গা রাখা হবে না
হবে না তো আর খেলা
তোদের স্মৃতি মন থেকে
যাবে না কখনো ফেলা।

স্বামীজীর ক্রমবিকাশবাদ

শ্রীমতী মালবিকা বিশ্বাস
(সহ শিক্ষিকা)

বিবর্তন বা ক্রমবিকাশ কথাটি বললেই যার নাম সর্ব প্রথমে মনে পরে তিনি হলেন চার্লস রবার্ট ডারউইন। 1831 খ্রিস্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে তিনি তাঁর নিজস্ব জাহাজ ''HMS Beagle'' এ চেপে প্রকৃতিবিদ হিসাবে নতুন কিছুর সন্ধানে সমুদ্র যাত্রা করেন। দীর্ঘ পাঁচ বছর তিনি আটলান্টিক মহাসাগরের বিভিন্ন দ্বীপ, দক্ষিণ আমেরিকার উপকূল অঞ্চল, প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জ, বিশেষ করে দক্ষিণ আমেরিকার মূল ভূখণ্ড থেকে 600 কিমি. দূরের গ্যালাপোগাস দ্বীপপুঞ্জে পরিভ্রমণ করেন। ওই সকল স্থানের জলবায়ু, পরিবেশ এবং উদ্ভিদ ও প্রাণীদের বিশেষভাবে পর্যবেক্ষন করেন ও তাদের সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করেন। 1859 সালের 24 নভেম্বর ডারউইন তাঁর বহু তথ্য সমৃদ্ধ 'প্রাকৃতিক নির্বাচন' (Natural Selection) আকারে ক্রমবিকাশ তত্ত্বটি প্রকাশ করেন।

ডারউইনের মতে অনুন্নত জীব থেকে উন্নত জীবে পরিনত হতে Struggle for Existence (জীবন সংগ্রাম), Survival of the fittest (যোগ্যতমের জয়) Natural Selection (প্রাকৃতিক নির্বাচন) এর দ্বারা হয়ে থাকে। যোগ্যতমের প্রাপ্ত বিশেষ বৈশিষ্ট্য পরিবর্জন ও নির্বাচন পদ্ধতিতে ক্রমশ বিকাশ ঘটাবে নতুন প্রজাতির।

স্বামী বিবেকানন্দের মতে লড়াই ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা জীবের পূর্ণতা লাভের পক্ষে অনেক সময় প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। প্রকৃতিতে জীব বেঁচে থাকার জন্য নিজেদের মধ্যে সংগ্রাম করে জয়ী হয়। এই Evolution দ্বারা সংসারের বিশেষ কোন উন্নতি হয় না। আধ্যাত্মিক উন্নতির ক্ষেত্রে ও এটি প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। দার্শনিকদের মতে জীবমাত্রই পূর্ণ আত্মা। আত্মার বিকাশের তারতম্যেই নানাভাবে প্রকৃতির অভিব্যক্তি ও বিকাশ। প্রকৃতির অভিব্যক্তির প্রতিবন্ধকতাগুলি সরে গেলে আত্মার পূর্ণভাবে প্রকাশ ঘটে। এই প্রতিবন্ধকতাগুলি দূর হয় শিক্ষা-দীক্ষা, ধ্যান-ধারনা এবং ত্যাগের দ্বারা। স্বামীজীর মতে হাজার পাপীর প্রান সংহার করে জগৎ থেকে পাপ দূর করবার চেষ্টা দ্বারা জগতে পাপের বৃদ্ধিই হয়, উপদেশ দিয়ে জীবকে পাপ থেকে নিবৃত্ত করতে পারলে জগতে আর পাপ থাকে না। স্বামীজী আরও বলেছেন ডারউইনের ক্রমবিকাশবাদ নিম্নতর জীবের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলেও মানব জাতির ক্ষেত্রে নয়। মানুষকে উন্নত হতে গেলে জ্ঞান-বুদ্ধি বিকাশের মাধ্যমেই হতে হবে। পশুদের মতো পরের ধ্বংস সাধন করে নয়। মানবের সর্বশ্রেষ্ঠ Evolution একমাত্র ত্যাগের দ্বারা হয়। যে পরের জন্য যত ত্যাগ করতে পারে মানুষের মধ্যে সে তত বড়। আর নিম্ন শ্রেণির প্রাণীরা যে যত ধ্বংসাধন করতে পারে সে তত শক্তিশালী। মানুষের সংগ্রাম হচ্ছে মনে। মনকে যে যত নিয়ন্ত্রন করতে পেরেছে সে তত বড় হয়েছে। সুতরাং মনোসংযম, আত্মসংযম, জ্ঞান-বুদ্ধি বিকাশের দ্বারা, মান ও হুঁশ সম্বল করে উন্নত মানুষ হওয়া

যায়। এটিই প্রকৃত ‘ক্রমবিকাশবাদ’ (evolution) এটি এমন একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি যার মাধ্যমে পশুত্ব থেকে মনুষ্যত্বে, মনুষ্যত্ব থেকে দেবত্বে উত্তীর্ণ হওয়া যায়।

“অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে।।”

গীতা, ৬/৩৫

— হে মহাবীর, মন যে চঞ্চল এবং তাকে যে সহজে বশে আনা যায় না, তাতে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু হে কুন্তীপুত্র, অভ্যাস এবং বৈরাগ্য দ্বারা এটি করা সম্ভব”।

□ □ □

“ইন্দ্রিয়গুলির বিষয়াভিমুখী গতি নিবারণ ও সেগুলিকে সংযত করে নিজ ইচ্ছার অধীনে আনা — এটি সকল ধর্মসাধনেরই মূল ভাব”।

— স্বামী বিবেকানন্দ।

পথ ও জীবন

পূর্বাশা মন্ডল

দ্বাদশ শ্রেণি, বিজ্ঞান-বিভাগ, ক্রমিক সংখ্যা-35

জীবনের অন্ত নেই পথের মতই;
যতই থামাও তাকে নিজের মতই।
পথে চলার সময় হোঁচট খেতে হয়,
নইলে বোঝা যায় না কীভাবে চলতে হয়,
জীবনের চলার পথ নয়কো কখনও সমতল
তাইতো সে পথ চলাতে হই মোরা সবল
পথ মানেই উঁচু-নীচু,
ভয় পাইনা তবুও কিছু।
জীবন মানেও উঁচু-নীচু,
ভাই বলে কি হটবো পিছু।
পথ হয় নানা রঙের,
কোথাও ধূসর; কোথাও কালো,
জীবনও হয় নানা ঢঙের,
কারো রঙিন; কারো সাদা-কালো।
পথে থাকে অনেক গর্ত,
কোথাও বড়ো; কোথাও ছোট।
জীবনেও থাকে অনেক দুঃখ,
কিছু বেশি; কিছু খাটো।
এইভাবেই পথ এগিয়ে চলে;
যেমন ভাবে জীবন চলে।

শিক্ষামূলক ভ্রমণ (সায়েন্স সিটি)

প্রীতম সরদার
অষ্টম শ্রেণি, খ-বিভাগ, ক্রমিক সংখ্যা-9

14 সেপ্টেম্বর সিঁথি রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ বিদ্যামন্দিরের তরফে যে সায়েন্স সিটির শিক্ষামূলক ভ্রমণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল, তাতে আমরা সবাই খুব আনন্দিত। সেখানে যাওয়ার জন্যে আমাদের সকলকে সকাল আটটায় স্কুলে প্রবেশ করার কথা বলা হয়েছিল এবং সেই মতো আমরা সকালে স্কুলে গেলাম এবং নিজেদের ক্লাসে বসলাম। আমাদের সকালের জলখাবার দেওয়ার পর বাসে উঠে পড়লাম সায়েন্সসিটির উদ্দেশে যাওয়ার জন্য এবার প্রায় "এক" ঘন্টার মধ্যে সেখানে প্রবেশ করলাম। এরপর সেখানে আমাদের প্রথমে কিছু ছবি তোলার পর আমরা "Auditorium" এর ভেতরে ঢুকলাম সেই দিন এখানে যাওয়ার একটি মাত্র কারণ হল সেই দিনটি ছিল "World First Aid day"। এবং Auditorium এর মধ্যে ছিলেন জন অ্যাম্বুলেন্সের Dr. Amitabha Biswas সেখানে তিনি আমাদের কিছু কথা বলেছিলেন তা হলো—

(i) Basic life Saving Techniques যেমন
CPR : 'Cardio Pulmonary resuscitation
BLS : Basic Life Support
ALS : Advance life Support

(ii) আমাদের শরীরে মোট 14 লক্ষ কোটি কোশ আছে।

(iii) শরীরে মোট ৩টি অংশ আছে যা খুব গুরুত্বপূর্ণ।
সেগুলি হলো হৃৎপন্ড বা হৃদয়, ফুসপুস এবং মস্তিষ্ক।

(iv) Casuality Vital needs —
ABC Rule
A : Open the Airway's
B : Breathing
C : Circulation

এছাড়া আমাদের শরীর পা থেকে মাথা পর্যন্ত 14 জোড়া ধমনি রয়েছে।

(iv) কোন মানুষের গালে দুটি নার্ভ থাকে অপটিক নার্ভ এবং সাইনাস নার্ভ।

(vii) কোন মানুষ যদি অজ্ঞান হয়ে পড়ে তাহলে তার বুকে 30 বার ধীরে ধীরে চাপ দিতে হবে এবং মুখে 14-20 বার হাওয়া দেওয়া উচিত।

কোন জায়গায় যদি চোট লাগে তাহলে সেখানে এই পদ্ধতিটা প্রয়োগ করা উচিত— Rice-Rest Ice Compression Elevation.

এই কথাটি বলে তিনি তার বক্তব্য শেষ করেন এবং তারপর আমরা যেখান থেকে বেরিয়ে Space Theatre দেখার জন্যে চললাম। এরপর আমাদের একটি 3D চশমা দেওয়া হলো। এবং ভেতরে প্রবেশ করে নিজের জায়গায় বসে গেলাম এবং Space Showটি আনন্দের সাথে উপভোগ করলাম। এরপর আমরা

বাইরে বেরিয়ে পড়লাম, নিজেদের দুপুরের খাওয়ার জন্যে। দুপুরের খাওয়াতে ছিল ডিমের কারি এবং ফ্রাইড রাইস। খাওয়া শেষ হওয়ার পর আমরা Time Machine দেখার জন্য লাইনে দাঁড়িয়ে পড়লাম এবং Time Machine-এর মধ্যে আমরা ঢুকে পড়লাম এবং সেখানের শো-টি দেখার পর আমরা বেরিয়ে আসলাম বাইরে বাসে উঠলাম এবং আমাদের হাতে একটি করে চিপস দিলেন আমাদের দায়িত্বে থাকা শিক্ষিকারা। এখানে গিয়ে আমরা অনেক কিছু জানতে পেরেছি। যেটা সেখানে না গেলে জানতে পারতাম না। Dr. Amitabha Biswas-এর কথাগুলি আমাদের প্রতিটি মুহূর্তে দরকার। আমার তরফ থেকে অমিতাভ স্যারকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন আমাদেরকে এই গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলি বলার জন্যে। আর আমাদের প্রধান শিক্ষক এবং অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকার কাছে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন, তার কারণ এত সুন্দর একটি ভাবনার জন্যে।

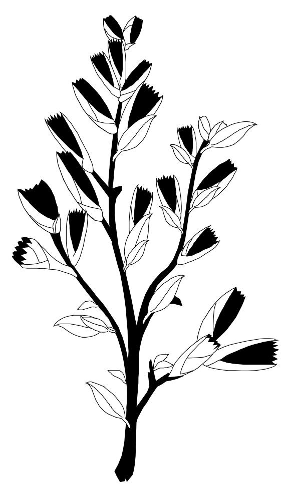

"যদি তুমি পড়তে পছন্দ না করো, তাহলে তুমি সঠিক বইটি খুঁজে পাওনি"।

— জে কে রাউলিং

Birthday Celebration

Book Day 2025

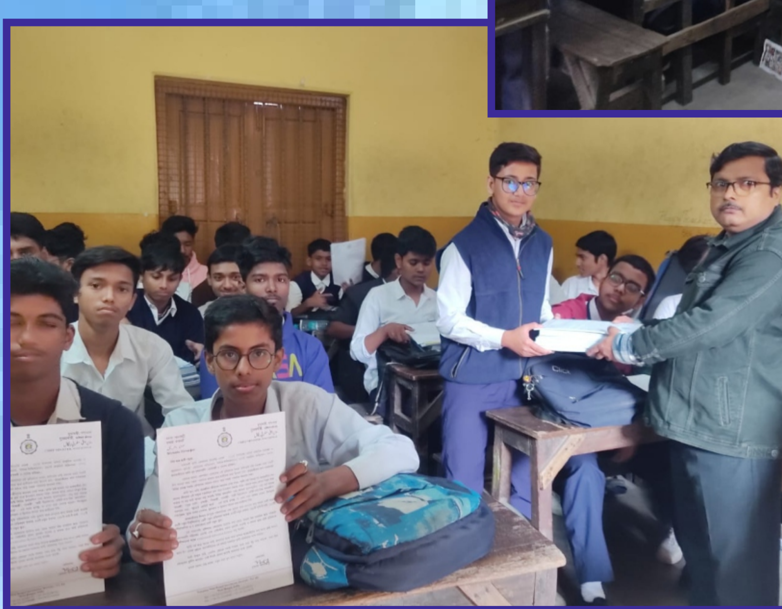

Annual Sports - 2025

Children's Day Celebration - 2025

Swachhata Pakhwada - 2025

Students' Week - 2025

Teachers Dey Celebration - 2025

অজন্তা-ইলোরা ভ্রমণ

অনিরুদ্ধ দাস
নবম শ্রেণি, খ-বিভাগ, ক্রমিক সংখ্যা-1

বাঙালি সর্বদা ভ্রমণ পিয়াসী। আমি-ও তার ব্যতিক্রম নই। গত বছর পুজোর ছুটিতে আমি আমার মা-বাবার সাথে আমার স্বপ্নের জায়গা অজন্তা-ইলোরা ঘুরতে গিয়েছিলাম। ইতিহাসের পাতায় যা পড়েছিলাম তা দেখবার সুযোগ পেয়েছিলাম। সেই আনন্দ বুকে নিয়ে 07.10.24 তারিখে হাওড়া থেকে দুপুর 1:30 নাগাদ গীতাঞ্জলি এক্সপ্রেসে উঠলাম। ট্রেন পরের দিন 3:20 নাগাদ জলগাঁও স্টেশনে পৌঁছায় এবং সেখানেই আমরা ওই দিনটি কাটাই। পরের দিন সকালে গাড়ি করে অজন্তার উদ্দেশে রওনা দিই। সেখানে MTDC গেস্ট হাউসে আমরা আমাদের ব্যাগপত্র রেখে গেস্ট হাউসের পাশ থেকে বাস ধরে পৌঁছে যাই অজন্তা গুহায়। সেখানে মোট গুহার সংখ্যা ছিল 30টি। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য গুহা গুলি হল— 1, 2, 9, 10, 16, 17, 19 এবং 26 নং গুহা। আজ থেকে প্রায় 2000 বছর আগে পাহাড় কেটে এত সুন্দরভাবে এই গুহাগুলি বানানো হয়েছে, যে বলে বোঝানো যাবে না। এই গুহা ছিল বৌদ্ধ ও জৈন সন্ন্যাসীদের আবাসস্থল। এই গুহাগুলিতে অঙ্কিত ছবির রং গুলি আজ ও অক্ষুন্ন আছে, যা দেখে আমাদের চোখ জুড়িয়ে গিয়েছিল। এছাড়াও এই গুহা গুলিতে ছোট-বড় অনেক চিত্র রয়েছে। এই সবকটি গুহা দেখতে আমাদের সময় লেগেছিল প্রায় 3 থেকে 4 ঘন্টা। এখানে একটি ভিউ পয়েন্ট ও রয়েছে যেখান থেকে এই সমস্ত গুহাগুলিকে একসাথে দেখতে খুবই সুন্দর লাগে। এরপর আমরা গেস্ট হাউসে ফিরে এসে বিশ্রাম নিই এবং পরের দিন সকালে আমরা রওনা দিই ঔরাঙ্গাবাদে অবস্থিত ইলোরা গুহার উদ্দেশে। দুপুর 11 : 00 নাগাদ হোটেল ঢুকে খাওয়া দাওয়া সেরে রওনা দিলাম ইলোরা গুহার উদ্দেশ্যে। ইলোরা গুহায় মোট 34টি গুহা রয়েছে। গুহাগুলির মধ্যে 1 থেকে 12 নং গুহাগুলি ছিল বৌদ্ধ গুহা। এই গুহাগুলির মধ্যে বুদ্ধদেবের নানা মূর্তি ও ছবি বর্তমান। 13 থেকে 29 নং গুহা হল হিন্দুদের গুহা। যেখানে হিন্দু দেব-দেবীর মূর্তি বর্তমান। এই গুহাগুলির মধ্যে 16নং গুহাটি ছিল সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। সেটি হল কৈলাস মন্দির। যেটি ইলোরা গুহার সবচেয়ে বেশি আকর্ষণীয় স্থান। এরপর 30 থেকে 34নং গুহাগুলি জৈন গুহা। এই গুহাগুলি দেখতে আমাদের প্রায় 3 ঘন্টা সময় লেগেছিল। অজন্তা ও ইলোরো এই দুটি গুহাই পাহাড় কেটে বানানো হয়েছিল। অজন্তা ও ইলোরা গুহাগুলির সূক্ষ্ম কার্যগুলি ছিল লক্ষণীয়। ইলোরা গুহা দেখে আমরা তার পাশেই অবস্থিত ঘৃষ্ণেশ্বর জ্যোতির্লিঙ্গ মন্দিরটি দর্শন করি। যেটি ছিল 12টি জ্যোতির্লিঙ্গের মধ্যে একটি। এরপর আমরা হোটেলে ফিরে আসি। পরেরদিন সকালে আমরা ঔরাঙ্গাবাদের পাশে অবস্থিত কিছু দর্শনীয় স্থানে যাই। যেমন— দেবগিরি দুর্গ, ছত্রপতি শিবাজি মিউজিয়াম, সোনেরি মহল, ঔরাঙ্গাবাদ গুহা প্রভৃতি। এরপর 12.10.24 তারিখে আমরা মানমাড জংশন থেকে হাওড়া দুরন্ত এক্সপ্রেসে করে হাওড়ার উদ্দেশে রওনা দিই। পরের দিন 13.10.24 তারিখে আমরা রাত্রি 12টা নাগাদ বাড়িতে পৌঁছোই। অজন্তা-ইলোরা ভ্রমণ ছিল আমার জন্য খুব আনন্দের যা আমি কখনোই ভুলবো না।

পুরী ভ্রমণ

বিট্টু মন্ডল
দশম শ্রেণি, খ-বিভাগ, ক্রমিক সংখ্যা-1

পুরীর কথা অনেক শুনেছিলাম। কিন্তু বিভিন্ন ব্যস্ততার মাঝে আর দেখার সুযোগ হয়নি। শেষে সেই সুযোগ হয়েছিল। গত বছর আমার বাৎসরিক পরীক্ষার পর বাবা-মায়ের সঙ্গে পুরী বেড়াতে গেলাম। বেড়াতে যাওয়ার জন্য কেনা-কাটা, গোছগাছ, টিকিট কাটা ইত্যাদির জন্য কয়েকদিন ব্যস্ততার মধ্যে কাটল। তারপর একদিন রাত্রেবেলায় হাওড়া থেকে ট্রেন উঠলাম। পরের দিন ভোরবেলায় পুরী স্টেশনে গিয়ে পোঁছোলাম। তারপর পুরী স্টেশন থেকে গাড়িতে করে থাকার জায়গা খুঁজতে বেরোলাম। কিছুক্ষণ পরে একটা ভালো থাকার জায়গা খুঁজে পেলাম। তারপর সেখানে খাওয়া-দাওয়ার সব ব্যবস্থা করে কিছুক্ষণ পরে আমরা সবাই মিলে সমুদ্রে করতে গেলাম। সমুদ্রে স্নান করতে গিয়ে আমরা প্রচুর আনন্দ করলাম। অনেকক্ষণ সমুদ্রে কাটানোর পর দুপুরের দিকে আমাদের থাকার জায়গায় ফিরলাম। তারপর দুপুরে খাওয়া-দাওয়া করে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলাম। তারপর সন্ধ্যার দিকে সমুদ্রের সৈকতে ঘুরতে গেলাম। ঘুরতে গিয়ে সমুদ্র সৈকত থেকে বিভিন্ন খাবার খেলাম, বিভিন্ন জিনিস কিনলাম। পরের দিন গেলাম পুরীর প্রধান দর্শনীয় স্থান জগন্নাথ মন্দিরে। মন্দিরে গিয়ে জগন্নাথ দেবের দর্শন করলাম, জগন্নাথ দেবের মহাপ্রসাদ খেলাম। পবিত্র এই মন্দিরের দর্শন করতে করতে অনেকটা সময় কেটে গেল। সন্ধ্যার দিকে আবার মন্দির চত্বরে ঘুরতে গেলাম। সেখানে গিয়ে বিভিন্ন খাজা, গজা ইত্যাদি খেলাম। বেশ কিছুক্ষণ ঘোরার পর নিজেদের থাকার জায়গায় ফিরে এলাম। পরের দিন গেলাম বিভন্ন জায়গায় ঘুরতে। কোনোরকের সূর্য মন্দির, ভুবনেশ্বর মন্দির, উদয়গিরি-খন্ডগিরি সহ প্রভৃতি দর্শনীয় স্থানে ভ্রমণ করলাম। অবশেষে পরেরদিন ভোরে পুরীর সূর্যোদয় দেখে দুপুরের ট্রেনে করে বাড়ি ফিরলাম। এই পুরী ভ্রমণ ছিল আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ ভ্রমণ।

A Day of Mishaps

Sukanta Roy
(Asst. Teacher)

On the last day of the past year
A tree was being cut on father's order,
Beside the pond, beneath electric wire.
The unripe tree fell on the wire in anger.
The electric pole got broken from the ground
And both fellows soused with huse sond.
Chaotic activities followed :
Electric officials allowed
To replace the pole against a fine
Of rupees one thousand into nine
And wages of six labourers
With meal for the wage earners.

On that day in the afternoon
While taking bath to eat soon
Singing a song being depressed,
Applied hot water on the head.
With the towel as I rubbed,
Bunches of hair I suffered.
To shave the head I went to the barber :
He scolded me repeatedly in anger,
''No Hindu shaves his head
Until parents are dead.''
Now I am somewhat bald-head.
Thus I spent the year end.

> ''বইয়ের ব্যাপারটা এমনই। এগুলো তোমাকে পা না সরিয়েই ভ্রমণ করতে দেয়''।
>
> — ঝুম্পা লাহিড়ী

বিজ্ঞান ও সামাজিকতা

ডঃ নব্যেন্দু প্রামাণিক
(সহ শিক্ষক, রসায়ন বিভাগ)

অনেকদিন আগে কোপেনহেগ্‌ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থ-বিজ্ঞানের পরীক্ষায় একটা প্রশ্ন এসেছিল— একটি ব্যারোমিটারের সাহায্যে কিভাবে কোনো সুউচ্চ অট্টালিকার উচ্চতা নির্ণয় করবে? উত্তরে একজন ছাত্র লিখলো— 'ব্যারোমিটারের মাথায় একটি দড়ি বেঁধে অট্টালিকার ছাদ থেকে ঝুলিয়ে দিতে হবে। এখন ব্যারোমিটার মাটি স্পর্শ করলে দড়িটার মাপ নিতে হবে। এবার দড়ি ও ব্যারোমিটারের দৈর্ঘ্য যোগ করলে যোগফলটিই হবে ভবনটির নির্ণেয় উচ্চতা।

পদার্থবিজ্ঞানের এমন সোজাসাপটা উত্তর পরীক্ষককে এমন রাগিয়ে দিল যে তিনি ছাত্রটিকে ফেল করিয়ে দিলেন। ছাত্রটিও ছাড়বার পাত্র নন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে লিখিতভাবে জানালেন যে তার উত্তরটি সম্পূর্ণ রূপে সঠিক এবং তিনি তাকে ফেল করানোর কারণও জানতে চাইলেন। পরীক্ষকও বিশ্ববিদ্যালয়কে জানালেন যে উত্তরটিতে পদার্থবিজ্ঞানের কোন তত্ত্বের উল্লেখ বা প্রয়োগ নেই। তাই ছাত্রটিকে ফেল করানো হয়েছে। তখন নিরুপায় হয়ে বিষয়টির মিমাংসা করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ একজন উচ্চ পর্যায়ের বিচারক নিয়োগ করলো।

বিচারক দেখলেন উত্তরটি সঠিক হলেও তাতে পদার্থ বিজ্ঞানের উল্লেখযোগ্য কোনো তত্ত্ব বা জ্ঞানের প্রয়োগ নেই। তিনি ছাত্রটিকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন তোমার উত্তরে পদার্থবিজ্ঞানের জ্ঞানের কোনো প্রয়োগ নেই। তোমাকে ছয় মিনিট সময় দেওয়া হল। এর মধ্যে তোমাকে এমন কোনো উত্তর দিতে হবে যার সাথে পদার্থবিজ্ঞানের মৌলিক নীতিগুলির কোনো একটির ন্যূনতম কিছু সম্পর্ক থাকে নতুবা তোমাকে অকৃতকার্য বলে ঘোষণা করা হবে।

বিচারকের কথা শুনে ছাত্রটি ভ্রু কুঁচকে চিন্তা করতে লাগল। এক মিনিট, দুই মিনিট, তিন মিনিট... পাঁচ মিনিট অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও ছাত্রটি একইভাবে ভাবতে থাকে। তখন বিচারক তাকে সতর্ক করে বললেন— 'তোমার সময় কিন্তু শেষ হয়ে আসছে।' ছাত্রটি তখন বললো যে তার কাছে অনেকগুলি যথাযোগ্য উত্তর প্রস্তুত আছে কিন্তু সে বুঝতে পারছে না কোন্‌টি বলবে।

বিচারক তাকে বলেন— তোমার যেগুলি মনে পড়ছে সেগুলিই বল।

তখন ছাত্রটি শুরু করলো—

প্রথমত, আমি ব্যারোমিটারটি নিয়ে ভবনটির ছাদে উঠবো। তারপর ছাদের উপর থেকে ব্যারোমিটারটি মাটিতে ফেলে দেবো। সেটি মাটিতে পড়তে যে সময় নেবে তা একটি বিরাম ঘড়ির সাহায্যে নির্ণয় করবো। তারপর $h = \frac{1}{2}gt^2$ সুত্রের সাহায্যে সহজেই ভবনটির উচ্চতা নির্ণয় করতে পারবো, যেখানে h-ভবনটির উচ্চতা, g-অভিকর্ষজ ত্বরণ এবং t-ব্যারোমিটারের পতনকাল। তবে সেক্ষেত্রে কিন্তু ব্যারোমিটারটির দফারফা হয়ে যাবে।

দ্বিতীয়ত, কোন এক সকালবেলায় বা বিকালবেলায় ব্যারোমিটারটিকে দাঁড় করালে তার ছায়া পড়বে। ফিতের সাহায্যে ব্যারোমিটার ও তার ছায়ার দৈর্ঘ্য মেপে নেবো। একইভাবে একই সময়ে ফিতের সাহায্যে বাড়িটির ছায়ার দৈর্ঘ্য মেপে নেবো। এবার সমানুপাতের নিয়ম অনুসারে ব্যারোমিটার ও তার ছায়ার দৈর্ঘ্যের অনুপাত বাড়িটির দৈর্ঘ্য তার ছায়ার দৈর্ঘ্যের অনুপাতের সমান হবে। এখান থেকে সহজেই বাড়িটির দৈর্ঘ্য নির্ণয় করতে পারবো।

এক লহমায় স্তব্ধতা ...

ছাত্রটি আবার শুরু করলো।

তৃতীয়ত বাড়ীটিতে যদি কোন জরুরী নির্গমন সিঁড়ি থাকে তবে সেখানে গিয়ে ব্যারোমিটার দিয়ে বাড়ীটির দেওয়াল বরাবর মাপতে মাপতে নিচে নেমে আসবো। এবার যতবার ব্যারোমিটার দিয়ে মাপা হয়েছে সেই সংখ্যাকে ব্যারোমিটারের দৈর্ঘ্য দিয়ে গুন করলেই বাড়ীটির উচ্চতা পাওয়া যাবে।

‘হুজুর, আরো উপায় আছে’ বলে ছাত্রটি আবার শুরু করলো। এটি কিন্তু আরো নিবিড় বিজ্ঞান ভিত্তিক উপায়। প্রথমে ভবনটির ছাদে উঠে যাবো এবং সেখান থেকে একটি সরু ধাতব তারের সাহায্যে ব্যারোমিটারটিকে ঠিক মাটি পর্যন্ত ঝুলিয়ে দেবো। এবার ব্যারোমিটারটিকে দেওয়াল ঘড়ির দোলকের মত দুলিয়ে দেবো। একটি বিরাম ঘড়ির সাহায্যে ঐ দোলকের একটি পূর্ণ দোলন সম্পূর্ণ করতে যে সময় লাগে সেই দোলনকাল (T) নির্ণয় করবো। এবার $T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$ [T = দোলকের দোলনকাল, l = দোলকের দৈর্ঘ্য তথা ভবনটির উচ্চতা এবং g = অভিকর্ষজ ত্বরণ] সুত্রের সাহায্যে খুব সহজেই ভবনটির উচ্চতা নির্ণয় করতে পারবো।

আবারও কিছুক্ষনের নিরবতা। বিচারকও কিছুটা আশ্চর্য হয়ে পড়লেন।

হুজুর আরও উপায় আছে বলেই ছাত্রটি আবার শুরু করলো—ব্যারোমিটারের সাহায্যে বাড়িটির ছাদে ও মাটিতে বায়ুচাপ মাপবো। ঐ দুটি বায়ুচাপের পার্থক্য থেকে পাওয়া • $p_2 - p_1 = hdg$ [P_2 = ভূপৃষ্ঠে বায়ুচাপ, P_1 = বাড়িটির ছাদে বায়ুচাপ, h = বাড়িটির উচ্চতা d = ব্যারোমিটারে ব্যবহৃত পারদের ঘনত্ব, g = অভিকর্ষজ ত্বরণ] সুত্রের সাহায্যে বাড়িটির উচ্চতা নির্ণয় করতে পারবো।

হুজুর যদি এই কঠিন বৈজ্ঞানিক নীতির প্রয়োগ ও জটিল গাণিতিক গণনার মধ্যে না গিয়ে একটু উপস্থিত বুদ্ধির প্রয়োগ করি তবে নিঃসন্দেহে একটি সহজ পন্থা অবলম্বন করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে ভবনটির রক্ষণাবেক্ষনের দায়িত্ব পালনে যুক্ত ব্যক্তিটিকে বলবো যদি সে বাড়ীটির নকশা দেখে বাড়ীটির উচ্চতা কত বলে দেয় তবে তাকে এই সুন্দর চক্‌চকে ব্যারোমিটারটি উপহার হিসেবে দেওয়া হবে।

সামান্য সময়ের মধ্যে এতগুলি সঠিক উত্তর শুনে বিচারক বিস্মিত হলেন এবং তৎক্ষণাৎ ছাত্রটিকে যোগ্য মর্যাদাসহ পাশ করানোর আদেশ দিলেন। সেই ছাত্রটি আর কেউ নন — বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী নীল্‌স বোর, প্রথম ডেনিশ বিজ্ঞানী হিসাবে যিনি ১৯২২ সালে পদার্থ বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার জয়লাভ করেন।

অনেকদিন পর আবার স্কুলের পত্রিকা প্রকাশ, আবারও কিছু লেখার তাগিদ। আর লেখা মানেই ছাত্রদের আরো বিজ্ঞান মনস্ক করে তোলার চেষ্টা, আরও বেশি বিজ্ঞান অভিমুখী করার একটা প্রয়াস।

যদি প্রশ্ন করা হয় বিজ্ঞান কি? সবাই বলবে বিজ্ঞান মানে বিশেষ জ্ঞান। আসলে প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে যা ঘটে তা জানার বিষয়ই বিজ্ঞান। সেই বিজ্ঞানকে জানতে, সেই বিশেষ জ্ঞান অর্জন করতে আমাদের তিনটি ধাপ পার হতে হয়— পরীক্ষা, পর্যবেক্ষন ও সিদ্ধান্ত। সাধারনের পক্ষে এই তিনটি ধাপ পার করে সেই বিশেষ জ্ঞান অর্জন সম্ভব নয়। সেটা করে থাকেন বিজ্ঞানীরা। সাধারণের উচিত বিজ্ঞানীদের সেই কার্যকারনের ব্যাখ্যাগুলোকে মান্যতা দেওয়া।

বলতে দ্বিধা নেই আজ একবিংশ শতাব্দীতে এসেও আমরা আমাদের আকাঙ্খা পূরণের জন্য ভীষণভাবে অবৈজ্ঞানিক পথে চালিত হই। আমরা চাষ করে শষ্য ফলানোর আনন্দ থেকে সহস্র যোজন দূরে থেকে খুঁজে বেড়াই গুপ্তধন। পরিশ্রম করে সফলতা লাভ করার আনন্দ থেকে নিজেকে বঞ্চিত রেখে খুঁজে বেড়াই কোনো চট্‌জলদি উপায়। এটা আমাদের বিজ্ঞান সম্বন্ধে অনীহা তথা অজ্ঞতাই প্রকাশ করে।

আসলে বিজ্ঞান আমাদের ভাবতে শেখায়। বিজ্ঞান বুঝতে শেখায় কোনটা ভালো আর কোনটা মন্দ। আর সেই বিজ্ঞান মনস্কতা থেকেই আসে সমাজচেতনা। অবশ্যই সেই চেতনা জাগায় মূল্যবোধ। নির্দ্বিধায় বলা যায় যে দেশের নাগরিক যত বেশি বিজ্ঞান মনস্ক সেই দেশ তত বেশি সমাজ সচেতন। সেই দেশ তত বেশি উন্নত।

একটি ঘটনার কথা এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক বলে মনে করি। নরওয়ের রাজধানী অস্‌লো থেকে প্রায় ষাট কিমি উত্তরে গার্ডারমোয়েল নামে একটি ছোট্ট শহর আছে। অবশ্য একে শহর না বলে আধা শহর বা গঞ্জ বলাই ভালো। একটা আর্ন্তজাতিক বিমানবন্দর আর কিছু দোকানপাট নিয়েই এর অবস্থান।

সেখানকার একটা ছোট্ট খাবারের দোকানে বসে খবর সংগ্রহ করতে আসা এক ভারতীয় সাংবাদিক চা খাচ্ছিলেন। তিনি লক্ষ করেন একজন খরিদ্দার দোকানের ম্যানেজারকে বললেন আমাকে আটটি টিফিন প্যাক করে দিন আর তিনটি 'Suspension Account'-তে দিয়ে দিন। এবার তিনি আটটি প্যাকেট নিয়ে কিন্তু এগারটি প্যাকেটের দাম দিয়ে চলে গেলেন। সাংবাদিকটি কিছুক্ষন সেদিকে তাকিয়ে রইলেন এবং ভাবতে থাকলেন-ও আবার কি? এগারো প্যাকেটের পয়সা দিলেন কিন্তু নিয়ে গেলেন আটটি।

পরক্ষনেই আবার একজন খরিদ্দার এলেন। একই রকমভাবে তিনি ম্যানেজারকে বললেন— আমাকে তিনটি Lunch প্যাক করে দিন আর একটা 'Suspension Account'-তে দিয়ে দিন। তিনি তিনটি প্যাকেট নিয়ে গেলেন কিন্তু পয়সা দিয়ে গেলেন চারটির। এভাবেই চলতে থাকলো। এদিকে সেই সাংবাদিকটি আর কৌতুহল দমন করতে পারলেন না। সোজা ম্যানেজারকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন— 'তোমাদের এই 'Suspension Account'-টা কি আমাকে একটু বুঝিয়ে বলবে?

ম্যানেজার প্রাথমিক পরিচয় পর্ব সেরে নেওয়ার পর বললেন— 'তুমি আর এক কাপ কফি নিয়ে বস। একটু সময় নিয়ে ধীরে ধীরে খাও। নিজেই তোমার প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবে।

অগত্যা সাংবাদিক মহাশয় আবার এক কাপ কফি নিয়ে বসলেন। কাপের সাইজটা কিন্তু আমাদের তুলনায় অনেকটাই বড়। শেষ করতে বেশ সময় লাগে। তবুও সাংবাদিক মহাশয় সময় নিয়ে ধীরে ধীরে কফি খেতে লাগলেন।

কিছুক্ষন পরে লক্ষ্য করলেন এক বৃদ্ধ মানুষ দোকানে এসে ম্যানেজারকে জিজ্ঞাসা করলেন— 'বাবা, আজ Suspension Account-তে কিছু আছে?

ম্যানেজার অত্যন্ত আগ্রহের সাথে বৃদ্ধটিকে বললেন— হ্যাঁ হ্যাঁ আছে। বলে তাকে বসিয়ে খেতে দিলেন। অন্য খরিদ্দারের মতোই যত্ন আত্তির কোন ত্রুটি রাখলেন না। বৃদ্ধলোকটিও তৃপ্তিভরে খেয়ে ম্যানেজারকে ধন্যবাদ দিয়ে চলে গেলেন। এবার ম্যানেজারটি ভারতীয় সাংবাদিকটির দিকে কিছুক্ষন তাকিয়ে রইলেন। সাংবাদিকটির বুঝতে অসুবিধা থাকলো না যে বৃদ্ধ লোকটি যে খাবার খেলেন সেটি ঐ Suspension Account-তে রাখা খাবারের একটি অংশ। সাংবাদিক তৎক্ষনাৎ নিজের খাবারের দাম মিটিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন। ভাবতে লাগলেন এখানকার মানুষ পরস্পরের প্রতি কি ভীষণ শ্রদ্ধাশীল! যিনি খাবারের পয়সা দিলেন তিনি জানলেন না তিনি কাকে খাওয়ালেন। আর যিনি খেলেন তিনিও জানলেন না যে তিনি কার পয়সায় খেলেন। মূল্যবোধের প্রতি কি অসীম সম্মাননা।

বলতে খারাপ লাগে আমরা এমন সামাজিকতা এমন মূল্যবোধ থেকে কয়েক যোজন দূরে অবস্থান করি। এতো সরলীকরন হয়তো ঠিক নয় কিন্তু অনেকাংশেই সেটা যে সত্যি তা জোর দিয়েই বলা যায়।

করোনা মহামারীর সময় একটা পোষ্ট সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছিল। সেখানে একজন বৃদ্ধা মাহিলাকে কোনো এক ব্যক্তি একটি মগে করে কিছু চাল দিচ্ছিলেন আর সেই মগটা অন্তত দশ জন ব্যক্তি হাত বাড়িয়ে ছুঁয়ে ছিলেন। অপর একজন ব্যক্তি সেটির ছবি তুলে সমাজমাধ্যমে পোষ্ট করেছিলেন, নিজেদের বিজ্ঞাপনের জন্য। নিজেদের জাহির করার জন্য—যে ওনারা অসহায়দের প্রতি কত সহানুভূতিশীল।

এরকম পোষ্ট দেখে লজ্জায় কুঁকড়ে যেতে ইচ্ছা করে। মানুষের অসহায়তার প্রতি কি চরম নিষ্ঠুরতা! মানবিকতার কি ভীষণ অপমান! কিছু দান করলে তার ছবি তুলে বিজ্ঞাপন হিসাবে সেটা ব্যবহার কতটা সামাজিক সেই বিতর্কে না গিয়েও বলা যায় সত্যিই হয়তো আমরা ততটা সামাজিক হয়ে উঠতে পারিনি।

বিরুদ্ধ মত থাকতেই পারে। তাদের জন্য বলি উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে ভারতের অগ্রগতি যে কোন দেশের কাছেই ঈর্ষনীয়। আমরা অর্থনৈতিক দিক থেকে অনেকটাই শক্তিশালী। সামরিক বলেও যথেষ্ট বলীয়ান। মহাকশ গবেষণাও আমাদের সাফল্য চোখে পড়ার মত। তবুও মনে রাখতে হবে সার্বিক সামাজিক উন্নয়ন আমাদের কাছে আজও অধরা। তা না হলে কলকাতা মহানগরীতেই প্রায় দশ বছর ধরে ভাগাড়ের মরা পশুর মাংস খোলা বাজারে টাটকা মাংসের নামে বিক্রি হয় কিভাবে এই প্রশ্নটা কিন্তু থেকেই যায়।

পরিশেষে একটা কথা বলবো বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং এর কথায় আমরা আমাদের আয়ু বাড়াতে পারি কিন্তু আরও যারা বেঁচে আছে তাদের জীবন যাত্রার মান বাড়ানো আরো জরুরী। তার এই বক্তব্যের তথা আবেগের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে হলে আমাদের আরও অনেক বেশি বিজ্ঞান সচেতন হতে হবে, হতে হবে আরও বেশি সামাজিক। তার জন্য সকলের মধ্যে বিশেষ করে ছাত্রদের মধ্যে বিজ্ঞান মনস্কতার প্রসার ঘটাতে হবে। সুস্থ সমাজ গড়ার লক্ষ্যে আমাদের সবাইকে আরও অনেক দায়বদ্ধ হতে হবে। মনে রাখতে হবে ব্যস্ততার সব অহমিকা বিলীন হয়ে যাবে, থেকে যাবে সময়ের ইতিহাস।

কবিতা লিখতে বসার সময়

সুজয় বাগ
অষ্টম শ্রেণী, ক-বিভাগ, ক্রমিক সংখ্যা-6

এই কবিতাটি আজকেই শেষ করবো,
কিন্তু শেষ হয় আর কোথায় এই কবিতা।
আজ নয়, কাল নয়, পরশুও না,
কবে করবো শেষ কবিতা।

ওহে কবিতা তুই কিরে,
শেষ হবিনা কোনোদিনই
হ'না শেষ তাড়াতাড়ি,
করিসনে আর হানাহানি।

আমায় লিখতে হবে, লিখতে হবে,
লিখতেই হবে আজ এই কবিতা।

এই কবিতা ভাবে কি আমায়?
আমি অলস, নাকি ফাঁকিবাজ।
মাথাটা আজ বড্ড গরম,
কবিতা সত্যি বড় ধড়িবাজ

আমার মাথাটা হোতো না অতো গরম,
যদি না হতো এই অসভ্যতা
তাইতো বলি, লিখতে হবে,
লিখতেই হবে আজ এই কবিতা।

আজকেই শেষ করব একে
যতই এ বসুক বেঁকে
ওহে কবিতা ভাবিস নে তুই
কবির থেকে হবি বড়োই।

তুই যদি শেষ না হো'স,
তবে তোকে আমি আর লিখবোনা।
হ'না শেষ তাড়াতাড়ি,
ধৈর্য ধরতে পারবো না।

নয়নতারা

লিজা খাতুন
একাদশ শ্রেণি, বাণিজ্য-বিভাগ, ক্রমিক সংখ্যা-89

নয়ন ৭/৮ সাত-আট বছরের ছোট্ট মেয়ে। ওপার বাংলার খুলনা জেলার এক প্রত্যন্ত গ্রামে সাঁতরাখালির বাসিন্দা। ছোটো এক চালাঘরে সে থাকে। ছোটো ঘরের সামনে একটি কুলগাছ এবং তার পাশে এক পুকুর। পুকুরটি বড়ো বড়ো তালগাছে ঘেরা। এসবই তার ঠাকুরদার সম্পত্তি।

মেয়েটির পরিবারে তার মা ও নানা। নয়নের বাবা বিদেশ গেছে ভাতের অভাব মেটাতে। নয়ন ছিল একটু শান্ত প্রকৃতির, কিন্তু গেছো। নয়নের চুল ছিল কোমর সমান, ছিমছিমে ডাগর-চোখো।

তার সারাদিন কেটে যেত মাঠে-ঘাটে ঘুরে ঘুরে, গাঙে সাঁতার কেটে, খাল-বিলে শাপলা তুলে কিংবা কারো গাছের পেয়ারা চুরি করে।

ভোর রাত থেকে টুপটাপ শব্দ হতে থাকে। নয়নদের গাছ থেকে কুল পড়ার শব্দ। তার মা'র দুশ্চিন্তায় ঘুম হয় না। আর একটা দিন শুরু হতে চলল। কিন্তু, সে ভাবছে কি করে নয়ন ও তার নানার ভাতের যোগান দেবে। নয়নের ঘুম ভাঙ্গল। সে আড়মোড়া খেয়ে মায়ের কোলে আরও কিছুক্ষন ঘুমালো। তারপর মা ও মেয়ে উঠান থেকে টসটসে কুল কুড়ালো। নয়নের ঠাকুমার মোরগগুলি ডেকে উঠল। আকাশে আলো আরো স্পষ্ট হলো। নয়নের মা ঝাঁট দিয়ে গেল। পুকুরধার থেকে তুলে আনল একগোছা কলমি শাক। তা দিয়েই আজ ভাতের জোগান দেবে নয়নের মা। এক পোয়া তেল এনেছিল পাড়ার দোকান থেকে তাও এক সপ্তাহ আগে, যা তেল আছে তা দিয়ে আজ নয়নের মা-এর দিব্বি রান্না হয়ে যাবে। একটু বেলা হলে নয়নের নানা নয়নকে নিয়ে যায় গাঙে। নয়ন আগে সাঁতার কাটতে পারত না। নয়নের নানা নয়নের পেটের নীচে তার হাতদুটো দিয়ে নয়নকে ভাসিয়ে রাখত। নয়ন হাত-পা ছুঁড়ত। এইভাবেই নয়নের নানা নয়নকে সাঁতার শেখায় মাত্র পাঁচ বছর বয়সে। এখন এমন অনায়াসে গাঙের এপার থেকে ওপার হয়।

আজ শুক্রবার। রোদের বড্ড তেজ। গাছের পাতারা যেমনি নুইয়ে পড়েছে, তেমনি নয়নও শান্ত হয়ে গেছে, সে তার গাছের ডালে নয়, গাছের নীচে ছায়ায় বসে আছে। সাথে নয়নের নানা। নয়নের নানা কাদা মাটি দিয়ে বেগুন, ঢ্যাঁড়স, গাজর বানিয়ে দিচ্ছে এবং নয়ন তা নিয় রোদে রাখছে। নয়নের মনে পড়ে আজ হাটবার। নানা আজ হাটে যাবে। নয়ন তার নানাকে বলে আজ হাটে গেলে আমার জন্য সিঙ্গাড়া কিনে আনবে। নানা একটু চুপ করে থেকে বলল, "আচ্ছা, আনব।" নয়ন সারা বিকেল খেলে বেড়ায় এবং ছুটে তার মায়ের কাছে বলে, "নানা এসেছে?" প্রায় তিন-চারবার নয়ন ফিরে চলে যাওয়ার পর নয়নের নানা আসে এবং নয়নকে দেখে থমকে দাঁড়ায়। নয়ন নানার হাত ধরে বলে, "কই, সিঙ্গাড়া আনোনি?" নানা চুপ করে থাকে। নয়ন বোঝে নানার কাছে টাকা ছিল না। নানান কিছু বলার আগেই নয়ন নানাকে বলে "এই হপ্তায় আর খাব না, পরের হাটবারে মনে করে আনবে।" নানা নয়নকে জড়িয়ে ধরে সন্ধ্যেবেলা নয়নকে নানা গল্প শোনায়। সে গল্পে থাকে পশু, পাখি, রাজকন্যা সবকিছু।

এইভাবেই দিন কাটতে থাকে। নয়নের মা দরজির কাজ করে, ঘরে আছে একটি সেলাই মেশিন। তার মা সেলাই প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় হয়ে এই মেশিন পায়। এখন তা দিয়েই তার মা'র দু'এক পয়সা হয়। সেই দিনে কায়ক্লেশে তার মা সংসার চালায়। নয়নের বাবা দুই-তিনমাস পর একবার ফোন করে, কিন্তু টাকা পাঠানোর সামর্থ্য তার হয় না

নয়নের ঠাকুরদা, ঠাকুরমা তাদেরও সংসারে অভাব। নয়নের কাকু, দুই পিসি নিজেরাই দুবেলা দু'মুঠো খেতে পারে না। নয়নদের তারা কি দেখবে? নয়নের মা ছোটোবউ, তার ছোটো মেয়ে। ঠাকুরমা, অন্য ছেলে বউদের থেকে একটু বেশিই ভালোবাসতো। নয়নের ঠাকুরমার বাড়ি কেউ মিষ্টি আনলে নয়নকে লুকিয়ে একটি মিষ্টি বেশি খাওয়াতো। তিন বুড়ো-বুড়ীর তাদের নয়ন কিন্তু রাজরূপী হয়ে থাকত, নানা নয়নকে বড় বয়স অবধি কোলে করে নিয়ে ঘুরত।

এমনই এক বসন্তে নয়নের জ্বর হল। সে জ্বর সেরেও গেল কিন্তু তারপরই নানার জ্বর হল। গলা দিয়ে রক্ত পড়ে, গাঁয়ের ডাক্তার ওষুধ দিয়ে যায়, তাতেও কমে না। টাকা জোগাড় করতে না পারায় নয়নের মা নানাকে বড় ডাক্তার দেখাতে পারছিল না। পরে নিয়ে গেলেও ওষুধে কাজ হয় না। টাকার অভাবে নানাকে সে ফলও খাওয়াতে পারত না। নয়ন আর এখন ছুটে বেড়ায় না। যে সারাদিন বাড়িতে থাকে। নানা এখন কথাও বলতে পারে না। খাওয়া দাওয়া প্রায় বন্ধ। নয়নের মা ঠিক করে খুলনায় বড় হাসপাতালে দেখানোর। ঐ সরকারি হাসপাতালে তারিখের পর তারিখ পড়ে, নানার শরীর ভেঙ্গে যায়। জ্বরও কমে না। নানা নয়নকেও চিনতে পারছিল না। সেদিন বিকেলে নানা মারা গেল।

সেই গাঁয়ের গাছপালা, খালবিল সবই স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল, নয়নও তার মা'র হাহাকারে। নয়নকে কেউ থামাতে পারে না, অঝোরে সেই ছোট্ট মেয়েটি কাঁদতে থাকে। সন্ধ্যে গড়িয়ে রাত হয়, নয়নের কান্না থামে না। কাঁদতে কাঁদতে ঘুমের দেশে নানাকে স্বপ্নে দেখে সে শান্ত হয়।

অভাগিনী নয়নের মা ঠিক করে নয়নের বাবার কাছে চলে আসবে। সেই বসন্তের শেষ হওয়ার আগেই নয়নের মা নয়নকে নিয়ে ওপার বাংলা থেকে এপার বাংলায় চলে আসে। ছোট্ট নয়নের বকুলফুল খুব প্রিয় ছিল। সে ভেবেছিল যেখানে যাচ্ছে যদি বকুল ফুল না পায় তাই বকুল কুড়িয়ে ও মালা গেঁথে নিয়ে যায়। সে এখনও কাঁদে, কিন্তু এখন পশুপক্ষীতেও টের পায় না, চুপিসারে কাঁদে, সে ভাবে বুঝি তার কান্না দেখে তার মা'ও কেঁদে ফেলবে।

নয়ন, নয়নের নানার "নয়নতারা" হয়ে সেই পল্লীগ্রামে এমন জীবন্ত হয়ে থেকে গেল। আকাশ, বাতাস, খাল, বিল সবেতেই "নয়নতারা"। হয়তো সেই গাঁয়ের কোনো বউ বলে ওঠে "নয়নের নানা নয়নকে বড্ড ভালোবাসতো।"

আমাকে আমার মতো পড়তে দাও

রিকার্য সরকার
ষষ্ঠ শ্রেণি, খ-বিভাগ, ক্রমিক সংখ্যা-10

আমাকে আমার মতো পড়তে দাও
আমি পড়াকে নিজের মতো, কমিয়ে নিয়েছি
যেটা পড়িনি, পারিনি সেটা
না পড়াই থাক
সব পড়া কষ্ট ভীষণ।
এই পড়ার টেবিল আজ ছাড়খার
তবু পড়তে বসেছি আমি তিনবার
আমি পড়তে চাই না আজ আর
কোনো নতুন রকমের চ্যাপ্টার।
সেই চেষ্টা করছি আমি বারবার
না পড়েই পাশ করবার।

সে কী স্বপ্ন

প্রিয়ব্রত পাইন
অষ্টম শ্রেণি, খ-বিভাগ, ক্রমিক সংখ্যা-34

রিম ঝিম বৃষ্টি পড়ে
বসে আছি জানালার ধারে।
টিপ টাপ টুপ টুপ আওয়াজ আসছে কানে
বর্ষার বৃষ্টি যেন শরতের ডাক আনে।
ভালো লাগছে না আর এই ঘরে
কখন যাব এ ঘরের বাইরে।
ঝলমলে রোদ আর রামধনু জানিনা দেখব কখন
বৃষ্টি যেন পড়ছে তো পড়ছে এমন।
সূর্য লুকিয়ে পড়েছে মেঘের কোণে
কখন বেরোবে সূর্য কে তা জানে।
হঠাৎ মায়ের আওয়াজ এল কানে
উঠে দেখি এতো স্বপ্ন ছিল আমার মনে।

কোভিডে এক ঘটনা

সংকেত মাইতি

সপ্তম শ্রেণি, খ-বিভাগ, ক্রমিক সংখ্যা-1

সময়টা ছিল 2020 এর 30শে জানুয়ারি। এক বড়ো মহামারি ভারতের দিকে এগিয়ে এসেছিল। যার নাম কোভিড নাইন্টিন। এটি 2019 সালে চিনে প্রথম ছড়িয়েছিল। এটি ছিল ছোঁয়াছে যা থেকে বেঁচে ওঠা খুব মুশকিল ছিল।

সালটা ছিল 2018 এই সময় এক ছেলে তার মা বাবার সঙ্গে একটি ফ্ল্যাটে থাকতো। তার নাম সৌম দাস। সৌমর পড়াশোনায় একদমই আগ্রহ ছিল না। তার বয়স মাত্র 13 বছর। সৌমের বাবা মা সৌমকে নিয়ে খুব চিন্তিত হয়ে থাকত। সে সময় পেলেই টিভি দেখতে ও ফোনে গেম খেলতে বসে যেত। মাঝে মাঝে এই নিয়ে বাপ ও ছেলের মধ্যে ঝগড়া লেগেই থাকত।

সৌমর বাবা খুব কষ্ট করে পাড়ার একটি হোটেল চালাত। তার মাও হোটেল চালাতে সাহায্য করে দিত।

এই করে দু'বছর কাটল। সৌম এখন দশম শ্রেণিতে পড়ে। সালটা ছিল 2020। এই সময় সরকারি নির্দেশ অনুসারে জানা যায় যে করনা নামে এক ভাইরাস ভারতে ঢুকেছে যার দ্বারা প্রচুর মানুষ মরছে তাই মানুষ যাতে বেশি মারা না যায় তাই সরকার পুরো ভারতকে করে দিল গৃহবন্দি।

একদিন সৌম খুবই আনন্দ সহকারে নিজের ফোন দেখছিল। হঠাৎই সে শোবার ঘরের দিকে তাকাল দেখল যে তার মা ও বাবা কী যেন বলছে। ছেলের কান গেল বাবা মায়ের কথার দিকে। সেখানে বাবা মাকে বলছিলেন 'বলতো কী করা যায়? লকডাউনের জন্য হোটেলে তো কোনো লোক নেই। তার ওপর আলমারির সব টাকাও ফুরিয়ে এসেছে।' মা নিশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'কী আর করা যাবে? বেশি দরকার পড়লে আমার এই সোনার গয়নাটা না হয়।' বাবা একটু ক্লান্ত স্বরে বললেন, 'অত চিন্তার কিছু নেই। এটা পরে দেখা যাবে। অত চিন্তা করে শরীর খারাপ করার কোনো মানেই নেই।' সৌম তখনই ফোন ছেড়ে চুপ করে কিছুক্ষন বসে রইল। তারপর আরও দুমাস কেটে গেল। সৌমর এখন ফোনের নেশা কিছুটা কমেছে। এখন সে নিয়মিত দুবার করে পড়তে বসে। এই দেখে মা বাবা ছেলের উপর ভীষণ।

আরও কিছু দিন কেটে যায়। সৌম এখন পড়ায় অনেক ভাল হয়ে উঠেছে। কিন্তু সেই দিন বাবা রেশন আনতে গিয়ে ফিরতে একটু দেরি করেন। এসে বাবা বলেন যে তার শরীরটা ভাল লাগছে না। আর বোঝা যায় যে তার হালকা জ্বর এসেছে ও সে কিছুরই স্বাদ পাচ্ছেন না। শুনেই মা ও সৌম আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। এরপর তার বাবাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়, যা থেকে বোঝা যায় যে, বাবার করনা হয়েছে। তা শুনে মা ও ছেলের খুবই ভয় লেগে যায়। কিছুদিন মা বাবার খুব ভাল করে সেবা করে। সৌমও মাঝে মাঝে বাবাকে ওষুধ খাইয়ে দেয় ও মাথায় জলপট্টি দিয়ে দিত। ইতিমধ্যে বাবার খারাপ অবস্থা দেখে মা তার গয়না বিক্রি করে বাবাকে হাসপাতালে ভরতি করল।

আরও কিছু সপ্তাহ কাটল। মাও একদিন ঘুম থেকে উঠে আবার শুয়ে পড়ল আর ছেলেকে বলল, ‘আমি একটু পর উঠছি। তুই একটু ভাত ও ডাল বসিয়ে দে। সৌম ব্যস্ত হয়ে বলল, ‘কেন? কী হয়েছে তোমার?’ মা বলল, ‘জানি না, আমার একটু দুর্বল লাগছে।’ তারপর সৌম ভাত চাপিয়ে মায়ের কপালে হাত দিল দেখল বেশ গরম। সৌম বলল, ‘মা তুমি ঠিক আছ তো।’ মা বলল, ‘আমি ঠিকই আছি শুধু একটু বিশ্রামের প্রয়োজন। সৌম কিন্তু মনে মনে ভাবছিল মায়েরও নিশ্চই করনা হয়েছে। তারপর সৌম খুবই কষ্টে মায়ের খেয়াল রাখে ও রান্না করে দুবেলা। সংসারের পুরো দায়িত্ব পড়ল সৌমর উপর।

হঠাৎ একদিন সৌম ফোনে দেখে যে করনার অ্যান্টিডোজ আবিষ্কার হয়েছে। সে এতোই খুশি হল যে সে ছুটে গিয়ে মাকে বলল। এই কথা শুনে মা ও খুব খুশি হল। মা বলল, ‘এবার হয়তো সব ঠিক হয়ে যাবে।’ কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে মায়েরও অবস্থা খারাপ হয়ে গেল। সে বেশি কিছু না খেয়ে-খেয়ে দিন দিন যেন দুর্বল হয়ে হড়েছিল। তাই সৌম কিছু না ভেবে তার মাকেও হাসপাতালএ ভর্তি করতে নিয়ে যায়। কিন্তু হাসপাতালে ভর্তি করবার জন্য যে টাকা লাগে সে কথা সৌমর মনে আসেই নি। যখনই হাসপাতালের নার্স টাকা নিয়ে তার সঙ্গে আলোচনা করতে লাগল তখন সৌম হতাশ হয়ে পড়ল। সৌম তখন তার স্কুলের হেড মাস্টারমশাইকে ফোন করে। আর হেড মাস্টারমশাইকে নিজের পরিস্থিতি জানালো। আর টাকার কথাও বলল। শুনে হেড মাস্টারমশাই আরও ক’জন স্যার ও ম্যামের থেকে সাহায্য নিয়ে তাকে ফোনে এক লক্ষ টাকা পাঠালেন। দেখে সৌম এতই খুশি হল যে তার চোখ দিয়ে দু ফোঁটা জল বেরিয়ে গেল। তারপর তার মা ও বাবা আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে উঠল।

এই বছরই শেষের দিকে সৌমর মা ও বাবা চোখে এক অবিশ্বাস্য ঘটনা এসে উপস্থিত হল। সে ছেলের কোনোদিনই পড়ায় আগ্রহ ছিল না সে মাধ্যমিক পরীক্ষা গোটা রাজ্যে চতুর্থ হয়ে উঠল। এই দেখে মা ও বাপের ছেলের ওপর গর্বের অন্ত থাকল না।

“পড়া গুরুত্বপূর্ণ। যদি তুমি পড়তে জানো, তাহলে পুরো পৃথিবী তোমার জন্য উন্মুক্ত হয়ে যাবে”।

— বারাক ওবামা

অভিনন্দনকে অভিনন্দন

শ্রীমতী মালবিকা বিশ্বাস (সহ-শিক্ষিকা)

হে বীর সৈনিক
তোমাকে জানাই প্রণাম।
একশো ত্রিশ কোটির মুখে
আজি তব নাম।।
ক্ষুদ্র স্বার্থ দিয়া বিসর্জন
আত্মত্যাগের পথ করিয়াছো বরণ।
সাহস ও বীরত্বে গাঁথা কাহিনী
ভারতীয় যোদ্ধা বায়ুসেনানী।।

বীরদর্পে রক্ষা করিয়াছো ভারতের মান,
স্বদেশমন্ত্রে দীক্ষিত উজ্জীবিত প্রাণ।
বীর সুভাষের পথে হও আগুয়ান
ভারত মায়ের শক্তি বলে হয়ে বলীয়ান।।

ছাত্রদলকে দাও প্রেরণা
উপেক্ষা করিয়া শত্রুপক্ষের লাঞ্ছনা।
আজি শুভদিনে ভারতবাসী গর্বিত।
আবারও করিবে ভারতকে সুরক্ষিত।
দিকে দিকে ভারতের জয়গান
মহামানবের মিলন ভূমি হোক পূণ্যবান।

তিন বন্ধুর হারানো দিন

আয়ুষ চক্রবর্তী
অষ্টম শ্রেণি, খ-বিভাগ, ক্রমিক সংখ্যা-1

তিনজন বন্ধু ছিল — আয়ুষ, অয়ন ও শ্রীজিত। তিন জনই ছিল এক বৃক্ষের তিনটি ডাল। স্কুল জীবন থেকেই তাদের বন্ধুত্ব শুরু। তাদের বন্ধুত্ব এতই গভীর ছিল যে, স্কুলের শিক্ষকরাও তাদের উদাহরণ দিতেন।

একইসঙ্গে একই বেঞ্চে বসত তারা। ক্লাসের ফাঁকে ফিস-ফিস করে কথা বলত তারা, শিক্ষকদের চোখ এড়িয়ে ছোট ছোট দুষ্টুমি করত। ধরা পরলে, তিন জনেরই কান ধরে দাঁড়িয়ে থাকার শাস্তি জুটত। সেই একজনের চোখ ছলছল করলে অন্যজন তার হাত ধরে সাহস দিত।

তাদের দুষ্টুমিরও একটা নিজস্ব জগৎ ছিল। কখনও, আয়ুষ অঙ্কের কঠিন সমস্যা সমাধানের সহজ উপায় বাতলে দিত। তাদের এই বাঁধন হারা বন্ধুত্ব স্কুলের দিনগুলিকে আরও রঙিন করে তুলেছিল।

কিন্তু, সময়ের নিয়ম বড় কঠিন, একদিন শ্রীজিতের বাবার বদলির আদেশ এল। তাদের ছোট্টো শহর ছেড়ে অন্য শহরে চলে যেতে তাদের পরিবারকে। এই খবরটা যেন আকাশ ভেঙে পড়ার মতো ছিল। আয়ুষ আর আয়নের কাছে। শ্রীজিত চলে যাবে— এই ভাবনাটাই তাদের বুকের ভেতরটা খাঁ খাঁ করে দিচ্ছিল।

আয়ুষ আর আয়ন শ্রীজিতের হাতে ধরে হাউহাউ করে কাঁদছিল। শ্রীজিতের বিদায়ের দিন স্কুল জুড়ে এক বিষন্নতার ছায়া নেমে এসেছিল। শ্রীজিতের চোখেও জল চিকচিক করছিল। যাওয়ার আগে তারা স্কুলের পিছনের পুরোনো আম গাছের সামনে দাঁড়িয়ে তারা দিনজনেই প্রতিজ্ঞা করেছিল, দূরত্ব যেন তাদের বন্ধুত্বে চিড় ধরাতে না পারে। তারা নিয়মিত চিঠি লিখবে। ফোনে কথা বলবে আর সুযোগ পেলেই দেখা করবে।

শ্রীজিত চলে যাওয়ার পর থেকেই আয়ুষ আর অয়নের স্কুলের দিনগুলি পানসে হয়ে গেল। সেই বেঞ্চ ফাঁকা হয়ে থাকত। টিফিনের সময় দুটো বাক্সই খুলত। আর দুষ্টুমি করার সঙ্গীও যেন হারিয়ে গিয়েছিল। তারা রোজ খেলার মাঠে যেত এই আসা নিয়ে যে যদি কোনো দিন অলৌকিক ভাবে শ্রীজিত ফিরে আসে। রাতের আকাশে অজস্র তারার দিকে তাকিয়ে তারা। তিনজনের একসাথে কাটানো সোনালি দিনের কথা ভাবত।

সময় তার গতিতে বয়ে চলল। স্কুলের গন্ডি পেরিয়ে আয়ুষ আর অয়ন কলেজে ভর্তি হল। তাদের অনেক নতুন বন্ধু হল। জীবনের নতুন পথে তারা এগিয়ে চলল। কিন্তু, তাদের হৃদয়ের গভীরে সেই পুরোনো বন্ধুর স্মৃতি অমলিন হয়ে রয়ে গেল। বিশেষ কোনো উৎসব বা ছুটির দিনে যখন চারপাশের আনন্দের মুখরতা তাদের স্পর্শ করত তখন তাদের মনে সেই হারিয়ে যাওয়া বন্ধুর অভাব তীব্রভাবে অনুভূত হত। তারা ভাবত, আজ যদি শ্রীজিত থাকত তবে এই আনন্দটা অনেক বেশি হত।

বছর পেরোলো। যুগের চাকা ঘুরল। আয়ুষ ইঞ্জিনিয়ার হল আর অয়ন শিক্ষক। দুজনেই নিজেদের কর্ম জীবনে প্রতিষ্ঠিত হল। ব্যস্ততার ভিড়ে সেই স্কুলের সোনালী স্মৃতিগুলো মাঝে মাঝে তাদের কাছে আবছা হয়ে আসত। কিন্তু একবারে মুছে যায় নি।

একদিন, অনেক বছর পর, এক অপ্রত্যাশিত ঘটনার ঘটল। আয়ুষ কাজের সূত্রে অন্য শহরে গিয়েছিল। সেই হোটেলের লবিতে বসে কফি পান করার সময় হঠাৎ তার চোখ পড়ল একটি পরিচিত মুখের দিকে। প্রথমে চিনতে পারি নি। সময়ের স্রোতে সেই ছেলেবেলার চেহারার অনেক পরিবর্তন এসেছে। কিন্তু সেই একই হাসিটা। সেই একই রকম চোখের চাহনি। কোথাও যেন তার চেনা লেগেছিল।

হঠাৎ সেই ব্যক্তি এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল।

"আপনি কী আয়ুষ?"

আয়ুষ চমকে উঠে বলল, "হ্যাঁ, আপনি?"

"আমি শ্রীজিত! চিনতে পারছিস না?"

আয়ুষের বিস্ময়ের সীমা রইল না। তার সেই হরিয়ে যাওয়া বন্ধু! কত বছর পর তাদের আবার দেখা হল। তারা দুজনেই আবেগে আপ্লুত হয়ে একে অপরের হাত ধরল। পুরনো দিনের কত কথা, কত স্মৃতি যেন মুহূর্তের মধ্যে তাদের মনে ভিড় করে এল।

সেইদিনই আয়ুষ শ্রীজিতের কাছে অয়নের খবর পেল। সেই রাতেই তারা তিনজন ভিডিও কলে কথা বলল। তারা তিন জন বহু বছর পর একসাথে কথা বলল। আনন্দে তাদের চোখে জল এসে গেল।

পরের সপ্তাহে শ্রীজিত আর অয়ন আয়ুষের শহরে গেল। তারপর, সেই পুরোনো দিনের মতো হাসি। গল্প, খুনসুটিতে ভরে গেল। তারা কয়েক দিন সেখানে থেকে তাদের পুরোনো স্কুলটি ঘুরে দেখল। তারা বুঝতে পারল, সময়ের স্রোতে অনেক কিছুই বদলায়। জীবন তার নিজস্ব পথে চলে। কিন্তু সত্যিকারের বন্ধুত্ব, যা হৃদয়ের গভীরে তৈরি হয় তা কখনও মলিন হয় না, কখনও হারিয়ে যায় না। দূরে থেকেও সেই বন্ধু তাদের হৃদয়ের খুব কাছেই ছিল। সেই দিনের পর থেকে তারা আবার নিয়মিত দেখা করতে শুরু করল। হারিয়ে যাওয়া সময়টাকে যেন আবার তারা নতুন করে ফিরে পেল।

"ভালো বই পড়া যেনো গত শতকের মহৎ লোকের সাথে আলাপ করার মতো"।

— দেকার্তে

ঐক্যতান

সুকান্ত রায় (সহ শিক্ষক)

কোন ঐক্যে মেলেনি মোর কোনো তান,
হয়েছে বেসুরো তাই আমার সব গান।
তবু মধ্য হেমন্তের পড়ন্ত বেলায়, নিকষ রাতে,
কে ডাকে তেত্রিশ বসন্ত হারানো আলো হাতে!

সন্ধ্যায় সাপ কথা মতো ঘরে দিয়েছে দেখা,
ললাটে গেছে ছেড়ে খোলস — বলিরেখা।
পাশের জঙ্গল থেকে শিয়ালের হুক্কা হুয়ায়
ঘেয়ো কেলোর তীব্র ঘেউ ঘেউ, কাল পেঁচা হুটায়।

চন্দন আর জবা ভাসাতে চায় গঙ্গা ধারা,
উৎসবে ডুগডুগি সকাতরে ডেকেছে — তারা।
এক মধুর অট্টহাসি আসে কাছে ক্রমে,
প্রতি পদে উৎফুল্ল মেদিনী নাচে রমে।

বোধ হয় হৃদয় জুড়ে এক কান্তিময়ী কালো
ভরে দেয় সত্য চেতনার আনন্দময় আলো।

“ভালো বন্ধু, ভালো বই, আর ঘুমন্ত বিবেক : এটাই আদর্শ জীবন”।

— মার্ক টোয়েন

প্রশান্তির বড়ন্তি

সুনীতা সাহা (সহ শিক্ষিকা)

কোথায় একটা যেন পড়েছিলাম যে, যাদের প্রিয় বিষয় ভূগোল তারা ঘুরতে ভালবাসে। কিন্তু আমাদের বিদ্যামন্দিরের সমস্ত বিষয়ের সব শিক্ষক-শিক্ষিকারাই ঘুরতে ভালোবাসেন। আমরা ২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে শুধুমাত্র দিদিমনিরা মিলে বকখালি বেড়াতে গিয়েছিলাম। সেই গল্প স্টাফরুমে শুনে সকলে মিলে রোজ কতশত জায়গায় বেড়ানোর নানা প্ল্যান চলতে থাকলো। শেষমেষ ঠিক হলো সবাই মিলে পুরুলিয়ার বড়ন্তি যাবো, সে বছরই পুজোর ছুটিতে। হোটেল বুকিং থেকে শুরু করে গাড়ি বুক করা সব দায়িত্ব নিলেন অঙ্কের মাষ্টার মশাই অরিন্দম স্যার। তার তত্ত্বাবধানে আমরা তেরো জন শিক্ষক শিক্ষিকা ও আমাদের কচিকাঁচা মিলিয়ে মোট আঠেরো জনের টিম তৈরি হলো। অনেক টিচার বিভিন্ন কারণে আমাদের সাথে যোগ দিতে পারলেন না।

যাবার দিন একটা এসি ট্রাভেলার বাস, একে একে দক্ষিণ কলকাতা থেকে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বাসে উঠিয়ে নিয়ে দমদমের পঞ্চাশ ফুট রাস্তায় এসে দাঁড়ালো। সমস্ত সদস্যদের নিয়ে সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ গন্তব্যের উদ্দেশ্যে রওনা দিলো। পথে বর্ধমানের কাছে প্রাতঃরাশ সেরে বড়ন্তি পৌঁছতে প্রায় তিনটে বেজে গেল। বাসে সারাক্ষণ আমরা নানা গানের সাথে তাল মিলিয়ে নেচে গেয়ে হুল্লোড় করে মেতে থাকলাম। তাই পৌঁছে সকলের পেটে তখন ছুঁচো দৌড়চ্ছে। রিসর্টে পৌঁছে লাঞ্চ করে নিয়েই ছুটলাম লেকের ধারে সূর্যাস্ত দেখতে। পড়ন্ত বেলায় চারপাশে পাহাড়ে ঘেরা লেকটা তখন যেন এক মায়াবি আলোয় ভেসে যাচ্ছে। অনেক ছবি তুলে ক্যামেরা বন্দি করলেও মনের ক্যামেরা তখন পরিপূর্ণ সেই নৈসর্গিক সৌন্দর্যের সামনে। এরপর অন্ধকার নামতেই আমরা আমাদের আস্তানায় ফিরলাম। সন্ধ্যাকালীন চায়ের আসরে নাচ, গান, কবিতা ও ছোটদের খেলায় মেতে উঠলো সবাই। সকলেই যেন ছোট বাচ্চা হয়ে গেছে। আমারা দোলনায় দোল খেলাম, ঢেঁকি চড়লাম। সারাদিনের ক্লান্তির পর তাড়াতাড়ি রাতের খাবার খেয়ে শুয়ে পড়লাম। পরদিন ভোর পাঁচটায় অ্যালার্ম দিয়ে রাখলাম কিন্তু অ্যালার্ম বাজার আগেই পাখির কলতানে মুখরিত হয়ে উঠলো চারপাশ। রিসর্টটা ছিল একটা শালবনের মধ্যে। নানা রকম গাছগাছালির সবুজের মধ্যে যেন এক টুকরো কোজি শেল্টার। আমরা সকলে মিলে আবার লেকের আরেকটা দিকে পৌঁছলাম। যাবার পথটা অপূর্ব সুন্দর বললেও কম বলা হবে। গহন অরণ্যের শেষে বিশালাকার লেক। স্থানীয় মানুষ শালুক ফুল তুলছে ও মাছ ধরছে। আমরা আমাদের ফটোসেশন পর্ব শেষ করে, যখন ফেরার পথ ধরলাম তখন সূর্যোদয় হয়ে গিয়েছে। চারদিকে লালচে আভা সাথে পাখির কিচির মিচির। একটা দুর্দান্ত প্রাকৃতিক অর্কেস্ট্রার ছন্দে চারদিক মোহিত হয়ে উঠলো। ফেরার পথে ট্রাইবাল গ্রামের বাড়িগুলো দেখলাম ও সেখানকার মানুষজনের সাথে কথা বললাম। তাদের সহজ সরল জীবনযাত্রা দেখে আমরা সবাই তখন মুগ্ধ। কী সুন্দর করে গোবর লেপে উঠোন পরিষ্কার করে রেখেছে, চারপাশ ঝকঝকে তকতকে একেবারে। অনেক বাড়ির দেওয়ালে আবার নানাধরনের কল্কা আঁকা।

কথায় আছে, ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে। আমরা শিক্ষক, পথে আসবার সময় অসীম স্যার ছোটদের লজ্জাবতী লতা থেকে শুরু করে বিভিন্ন গাছ ও তাদের নানা বৈশিষ্ট্য বোঝাতে লাগলেন। আমরা রিসর্টে এসে স্নান করে প্রাতঃরাশ করে ফেললাম। সেদিন আমাদের জয়চণ্ডী পাহাড়ে ওঠার কথা। দশটা নাগাদ বাস ছাড়লো। সেখানে পৌঁছে প্রায় পাঁচশো সিঁড়ি পেরিয়ে আমরা পাহাড়ের ওপরে পৌঁছলাম। ওপরে জয়চণ্ডী মাতার মন্দির। চারপাশে ল্যান্ডস্কেপ অপূর্ব, সেই সম্পর্কে ছোটদের কৌতূহল মেটানোর যথাসম্ভব চেষ্টা করলাম। সেখানে অনেকক্ষণ থেকে নিচে নেমে দেখলাম ওই জায়গায় হীরক রাজার দেশের শুটিং হবার জন্য সত্যজিৎ রায়কে শ্রদ্ধা নিবেদন করে একটি মঞ্চ তৈরি করা রয়েছে। সূয্যিমামা তখন মাথার ওপরে। আমরা ফেরার পথ ধরলাম। রিসর্টে এসে লাঞ্চ করে ক্লান্তিতে একপ্রস্থ ভাত ঘুম দিলাম সকলে। বিকেলে আবার লেকের ধারে সূর্যাস্ত পর্যন্ত থাকলাম। লেকের পরিবেশটা সত্যিই খুব নিস্তব্ধ আর শান্তির। সন্ধ্যের সময় সেদিন আমাদের ক্যাম্প ফায়ারের ব্যবস্থা ছিল। সেখানে নাচ গানের আসরে সকলেই মেতে উঠলাম।

সেদিন রাত বারোটায় ছিল অঞ্জনা ম্যামের জন্মদিনের সেলিব্রেশন। আমরা ডিনার করে ঠিক রাত বারোটায় কেক কাটিং করে, খুব হুল্লোড় ও মজা করে ঘুমোতে গেলাম। পরদিন আমাদের বাড়ি ফেরা সাথে অনেক জায়গা ঘুরে। তাই সেদিন ব্রেকফাস্ট করেই রওনা দিলাম। প্রথমে গড়পঞ্চকোট। সেখানে দুর্গের ভগ্নাবশেষ দেখে সেই জায়গার ইতিহাস বর্ণনা করলেন ইতিহসের শিক্ষক স্বপন স্যার। আমরা ওখানে থেকে গেলাম পাঞ্চেত বাঁধ, সেখানে গোপা ম্যাডাম ছোটদের নদী ও বাঁধের নানা রকম কার্যকলাপ বোঝালেন। সেই বক্তব্য আমি আবার মুখপুস্তিকাতে লাইভ টেলিকাস্ট করেছিলাম, তা দেখে আমাদের দেশ বিদেশের কত ছাত্র যে খুশি হয়েছিল তা বলে বোঝাতে পারবো না। তারপর কল্যাণেশ্বরী মায়ের মন্দিরে পুজো দিয়ে মাইথন বাঁধ দেখলাম। ফেরার পথে আসানসোলে লাঞ্চ করে শক্তিগড় থেকে ল্যাংচা খেয়ে ও কিনে বাড়ি ফিরলাম।

ফিরেছিলাম অনেকটা অক্সিজেন নিয়ে যা স্কুল খুললেই পরীক্ষা, প্রশ্ন তৈরি, খাতা দেখা, রেজাল্ট করার মত কাজে ক্লান্তি না এনে বরং অনেক বেশি উদ্যম নিয়ে কাজ করতে উদ্দীপ্ত করেছিল সকলকে।

"যখন তুমি বাধ্য হও না, তখন তুমি যা পড়ো, সেটাই নির্ধারণ করে যে তুমি কী হবে, যখন তুমি সাহায্য করতে পারবে না"।

— অস্কার ওয়াইল্ড

আমাদের বছর

সায়ন পড়্যা
অষ্টম শ্রেণি, ক-বিভাগ, ক্রমিক সংখ্যা-1

বৈশাখের ওই চড়া রোদে,
মানুষ যখন চেঁচিয়ে ওঠে।
বিকেল বেলায় আরাম দিতে,
কালবৈশাখীর ঝড় ওঠে।।

জ্যৈষ্ঠ আসে আগুন হাতে,
রোদের ছায়া পড়ে মাঠে।
পুকুর পাড়ে শালিক ডাকে তৃষ্ণার সুরে—
কারন মাটি তখন থাকে আগুনে পুড়ে।।

আষাঢ় মাসে বৃষ্টি ঝরে
গরিবেরা আশ্রয়-প্রার্থনায় মরে।
জলভরা দিন আর চাতক পাখির গান—
আষাঢ় মানেই মেঘলা আকাশ ভালোবাসার টান।

শ্রাবণ এলে মেঘেরা হাসে,
কদম ফুলের গন্ধ ভাসে।
ছাতা হাতে পথিক হাঁটে,
চোখে তার শ্রাবণের স্বপ্ন আঁটে।।

ভাদ্র মাসে আকাশ জুড়ে সাদা মেঘের ভেলা,
মেঘের নিচে সবুজ ধানের খেলা।
মাটির গন্ধে মন ভরে যায়,
পাকা কদম ঝরে পাতায়।।

আশ্বিন এলে নদীর ধারে,
শুধুই কাশ ফুল চোখে পড়ে।
দুর্গা মায়ের আগমনে,
ছোটোরা সব মহালয়ার গল্প শোনে।।

কার্তিক আসে ধানের ঘ্রাণে,
চাষিরা হাসে সোনার টানে।
পাকা ধান ঝুঁকে পড়ে,
কৃষকেরা আনন্দ করে।

অগ্রাহয়ণ এলে মাঠে হাসি,
সেখানে বাজে জীবনের বাঁশি।
কাস্তে হাতে কৃষক নাচে,
গ্রামের মানুষ খেয়ে বাঁচে।।

পৌষ মাসে পিঠে-পুলি,
যার কথা সবার আগে বলি—
ভোরবেলার খেঁজুর রস,
ভরে তোলে মাটির কলস।।

মাঘের শীত চাদর গায়ে,
পথিকেরা সব বাইরে বেরোয়।
সকালবেলায় দিতে পুষ্পাঞ্জলি,
আমরা সবাই স্কুলে চলি।।

ফাল্গুন আসে রঙে ভরে,
বসন্ত নাচে প্রেমের সুরে।
প্রকৃতি জুড়ে প্রাণের ফাঁকে,
বসন্ত নামে কোকিলের মধুর ডাকে।।

চৈত্র সংক্রান্তির টানে গ্রামে,
শেষের দিনে মেলা থামে।
বছর শেষে চৈত্র বলে—
নতুন যাত্রা সামনে চলে।

শুধু তোমারই জন্য

সমৃদ্ধি দাস
একাদশ শ্রেণি, বাণিজ্য-বিভাগ

স্বপ্ন স্বপ্ন ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ
তোমার চোখের তারায়, ছড়িয়ে দেবো।
প্রেম বলে আমার এ প্রেম
শুধু তোমারই জন্য, শুধু তোমারই জন্য
শুধু তোমারই জন্য।।

কবিতার আড়ালে শূন্যতা সরালে
যখন এসে দাঁড়ালে,
ভাবনা বিহীন মন সুর তুলে বাতাসে
নীল ঘামের ভাষাতে।

শহরের উষ্ণতম দিনে
বুকে হিমেল হাওয়া হেমন্তের হাত
দরজা জানালায় অবিরাম প্রেমের আঘাত,
আমি এসেছি আমি ...
শুধু তোমারই জন্য, শুধু তোমারই জন্য।

"কখনো বই ধার দিও না, কারণ কেউ কখনো সেগুলো ফেরত দেয় না; আমার লাইব্রেরিতে কেবল সেই বইগুলোই আছে যা অন্যরা আমাকে ধার দিয়েছে"।

— আনতোল ফ্রান্স।

একটি ছোট্টো দিনের অভিজ্ঞতা

সোনালি আদক

দ্বাদশ শ্রেণি, বিজ্ঞান-বিভাগ, ক্রমিক সংখ্যা-40

খাদ্য! যা আমাদের নিত্য দিনের সঙ্গী। বেঁচে থাকার জন্য যেমন জল, অক্সিজেন ও বাতাস এর গুরুত্ব আছে খাদ্যও সেই গুরুত্বেরর দিক থেকে কোনোভাবে পিছিয়ে নেই।

আমাদের মতো মধ্যবিত্ত পরিবারে বিলাসিতা বা অন্যান্য জিনিসের অভাব থাকলেও খাবারের কোনো রকম অভাব এর সম্মুখীন হতে হয় না। অথচ সেই খাবারই মনের মতো না হলে তাকে আমরা নাকচ করি। এটা খাব না! ওটা খাব না!। অবশেষে সেই খাবার গুলোর স্থান হয় ডাস্টবিনে বা কখনো নর্দমার ধারে।

কিন্তু সেই খাবারগুলোই যদি কোনো মানুষের খিদে মেটায়? এটা কি আমরা ভাবতে পারি? না পারি না। আমিও পারতাম না যদি না আমি সেই দিন এক ঘটনার সম্মুখীন হতাম।

তাহলে শোনো বলি, সেই দিনের ঘটনাটির কথা।

একদিন বিকালে আমি আমার মা আর বাবা বসে আছি। কিছুক্ষন বাদে মা আমায় এক বাটি ফল কেটে এনে দিল। আমি তো যথারীতি না! না! বলে এড়িয়ে দিচ্ছি। পরদিন দুপুরে আমার বাবা আমার হাত ধরে বাড়ির নীচে নিয়ে গেল।

প্রথমে আমি একটু অবাক হলাম, বাবা এমন করছেন কেন? তারপর নিচে গিয়ে যা দেখলাম তা দেখে আমি বিস্মিত হয়ে গেলাম। দেখলাম একজন বৃদ্ধ প্রায়ই ষাট বছরের ঊর্দ্ধে। ডাস্টবিনে পড়ে থাকা কিছু পচা লেবু তুলে ব্লেড দিয়ে কেটে খাচ্ছে। এটা দেখে নিজে একটু হলেও আমি লজ্জিত হয়েছিলাম মনে মনে। নিজেকে ধরে রাখতে না পেরে সাথে সাথে বাড়ি থেকে কিছু ফল এনে তাকে দিলাম। সে ফলগুলি পেয়ে খুবই খুশি হল ও আশীর্বাদ করল। এবং এক অদ্ভুত শান্তির হাসি হাসল। আমিই সেই দিন বুঝলাম খাদ্যের গুরুত্বটা। এবং সেই শান্তির হাসির প্রতিচ্ছবি আজও আমার চোখে ভাসে।

ন্যায়বিচার

রৌনক অধিকারী
দ্বাদশ শ্রেণি, বাণিজ্য-বিভাগ, ক্রমিক সংখ্যা-23

সে এক মেয়ে সে খুব ভালো
তার লড়াইয়ের কারণে পশ্চিমবঙ্গে তার নাম হলো।
তার পরিশ্রমের ফলে সে হল চিকিৎসক,
বেশ কয়েক নীচ হৃদয়ের মানুষের জন্য হারালো যে প্রাণ।

তারপর সেই খবর এল সবার কানে,
'বিচার চাই', 'বিচার চাই' বলে জনগণ নেমে গেল পথে।
লেখক থেকে অভিনেতা এখন সব একজোট
তা দেখে "ভয় পেয়ে গেলো বেশ কয়েকজন"।

আশায় ও ভরসায় আছে বসে তিলোত্তমার মা,
একদিন ঠিক পাবে মেয়ে ন্যায়বিচার।
মাঠের তিন শত্রু দল মোহনবাগান, ইষ্টবেঙ্গল ও মহামেডান হল একজোট
তা দেখে আবারও "ভয় পেয়ে গেলো বেশ কয়েকজন"।

ন্যায়বিচারের শ্লোগান হয়ে গেল বন্ধ
সময় এগোতেই তিলোত্তমাকে সবাই ভুলে গেলো।
'আর কবে, আর কবে'?
তিলোত্তমা পাবে ন্যায়বিচার?

জেগে ওঠো তোমরা আবার সেই নারীরা
তোমাদের করতে হবে রাত দখল আর একবার।
যুদ্ধ জয় না করে তোমরা থেমে যেও না।
তিলোত্তমার মতো আর কারোর সাথে ওই অন্যায় হতে দিয়োনা।

একটি ভ্রমণ কাহিনি

অনীশ বিশ্বাস
দশম শ্রেণি, খ-বিভাগ, ক্রমিক সংখ্যা-9

প্রত্যেক বছর কোথাও না কোথাও ব্যস্ত জীবন থেকে কিছুদিনের মুক্তি খুঁজে নেওয়ার উদ্দেশ্যে আমি ছুটে যাই। তেমনই আমার এই বছরের ভ্রমণ গন্তব্য মোহময়ী সুন্দরবন। আমাদের গন্তব্য, সুন্দরবনের যাত্রা শুরু হয় শিয়ালদা স্টেশন থেকে। এখান থেকে লোকাল ট্রেনে চেপে ক্যানিং স্টেশন হয়ে বাস কিংবা অটোতে আমরা পৌঁছে গিয়েছিলাম সোনাখালি। সেখান থেকে লঞ্চে করে সুন্দরবনের বুকে একটু একটু করে আমাদের প্রবেশ শুরু। লঞ্চে ওঠার পর থেকেই মুহূর্তে মুহূর্তে চারপাশে দৃশ্য বদলে যেতে থাকে।

বেশ খনিকটা যাওয়ার পর দেখা যায় বিভিন্ন ধরনের নাম না জানা গাছ। পাখিদের মিষ্টি আওয়াজ নদীর দুপাশ থেকে শোনা যাচ্ছে। লঞ্চ থেকে জলের দিকে চোখ পড়তেই দেখতে পেলাম বিখ্যাত গাঙ্গেয় ডলফিন বা চলতি ভাষায় যাকে বলা হয় শুশুক। তারপর লঞ্চ থেকে যখন নামলাম তখন সূর্য প্রায় পশ্চিম গগনে ঢলে পড়ার মুখে। শীতের দিন বলে একটু শীত শীত করতে লাগল। সুন্দরবন প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যে ভরপুর। আমাদের যে গাইড, তার কাছ থেকেই জানতে পারলাম ভারত-বাংলাদেশ এই দুই দেশ জুড়ে বিস্তৃত সুন্দরবনে প্রায় ৩৫০ প্রজাতির উদ্ভিদ পাওয়া যায়। এর মধ্যে অধিকাংশ ম্যানগ্রোভ জাতীয় উদ্ভিদ। পৌছনোর পরেরদিন জঙ্গল সাফারিতে পেরিয়ে দেখতে পেলাম ঘন বনের ফাঁক দিয়ে সূর্যের আলো এসে পড়ছে মাটিতে।

বিভিন্ন গাছ, পাখিদের আওয়াজ আর অদ্ভুত এক মায়াবী সমগ্র প্রকৃতিকে যেন ঘিরে রেখেছে। এরই মধ্যে বৃক্ষমূল আর ঠেসমূল যুক্ত গাছগুলি পরিবেশকে আরো মায়াবী করে তুলেছে। পথে চলতে চলতে চোখে পড়ল বিভিন্ন ধরনের অত্যন্ত সুন্দর সুন্দর সব ফুল আর লতাগুল্ম। গাইডের থেকে শুনলাম এই অঞ্চলে বহু ধরণের ভেষজ উদ্ভিদ পাওয়া যায়। সবচেয়ে মনোমুগ্ধকর গাছ গুলির মধ্যে চোখে পড়ল বিখ্যাত সুন্দরী গরান ও গেঁওয়া গাছ।

সুন্দরবনের অঞ্চলের আরেকটি সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য এবং অবিচ্ছেদ্য অংশ হল এখানকার প্রাণীকুল। সন্দরবনের স্থলভাগ বিভিন্ন ধরনের প্রাণীদের স্বর্গরাজ্য। এদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল রয়েল বেঙ্গর টাইগার। যদিও বর্তমানে বাঘের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যাওয়ার দরুন সহজে বাঘ চোখে পড়ে না।

জঙ্গল-সাফারির প্রথম দিনে আমরাও বাঘ দেখতে পাইনি। তবে চোখে যা পড়েছিল তা কোনো অংশে কম নয়। দূর থেকে আমরা দেখেছিলাম সুন্দরবনের বিখ্যাত চিত্র হরিণের পাল জল খেতে এসেছে। নদীর ধারে, গাছের ডাল থেকে উড়ে যাচ্ছে অদ্ভুত সুন্দর রঙের পাখিরা। এছাড়া চোখে পড়ল গোসাপ, বন বিড়াল আর কত কী।

এই ভাবে কয়েকটি দিন সুন্দরবন প্রকৃতির কোলে কাটিয়ে আমরা পুনরায় নিজেদের জীবনে ফিরে এলাম। ফিরে আসার জন্য আমরা বেছে নিলাম জলপথকে। সেই অভিজ্ঞতা অদ্ভুত সুন্দর ছিল। এখানে ভ্রমণের প্রকৃত সার্থকতা।

Bed in Summer

Sourav Das
Class-IX, Sec-A, Roll No-4

In winter I get up at night
And dress by yellow candle-light,
In summer, quiet the other way,
I have to go to bed by day.

I have to go to bed and see
The birds still hoppng on the trees,
Or hear the grown up people's feet
still going past me in the street.

And toes it not seem hard to you
When all the sky is clear and blue.
And I should like so much to play.
Should go to bed by day?

"তুমি যত বেশি পড়বে, তত বেশি জিনিস জানতে পারবে। যত বেশি শিখবে, তত বেশি জায়গায় যাবে"

— ডঃ সিউস

তিন বন্ধু

অরিশ হাইত

সপ্তম শ্রেণি, খ-বিভাগ, ক্রমিক সংখ্যা-2

অনেক দিন আগেকার কথা। এক গ্রামের একটি ছোটো বিদ্যালয়ে এক শ্রেণিতে তিন বন্ধু পড়ত, প্রথম বন্ধুর নাম করিম, দ্বিতীয় বন্ধুর নাম সৌম্যদীপ ও তৃতীয় বন্ধুর নাম শচীন। তিন বন্ধুর মধ্যে শচীন ছিল খুবই মেধাবী। জীবনে সে প্রতিটি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করত। করিম ছিল মাঝারি মেধা অর্জনকারী একটি ছাত্র। সৌম্যদীপ কোনোদিন বাড়িতে পড়তে বসে না। ও বিদ্যালয়ে সে শুধু খেলতে আসত। তবে সৌম্যদীপকে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করানোর দায়িত্ব নিয়েছিল তার দুই বন্ধু করিম ও শচীন।

তাদের তিনজনের মধ্যে একটি মিল ছিল। এরা তিনজনেই একই পরিমান দুষ্টুমি করত। স্কুল জীবনে তাদের জীবনে এমন কিছু ঘটনা ঘটে তারা যে কোনো কোনোদিনও ভুলতে পারেনি। তাদের বন্ধুত্ব ছিল খুবই গভীর। তাদের একে ওপরের প্রতি অগাধ বিশ্বাস ছিল। স্কুলে তারা অনেক মজার ঘটনা, টিফিন খাওয়া ভাগ করে করেছে। স্কুল জীবনের স্মৃতিগুলি তাদের জীবনে একটি বিশেষ স্থান দখল করে নিয়েছে। তারা জানত এই বন্ধুত্ব তাদের জীবনের এক সম্পদ। কোনো মূল্য দিয়ে যার হিসাব হয় না। তাদের দুষ্টুমির জন্য কেউ একজন শাস্তি পেলে সবাই কষ্ট পেত। তারা সবসময় একসাথে ছিল এবং থাকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল।

তারা একে ওপরের সুখ, দুঃখ, কষ্ট সব ভাগ করে নিয়েছিল। এইভাবেই তাদের জীবন হেসে খেলে চলে যাচ্ছিল, হঠাৎ করিমের বাবা চাকরি সূত্রে অন্য রাজ্যে চলে যান এবং করিমরাও তার বাবার সাথে চলে যায়। তিন বন্ধুর মধ্যে এক বন্ধু পরিবার সহ অন্য রাজ্যে চলে যায়। একজন বন্ধুকে ছাড়া থাকতে তাদের খুব কষ্ট হয় তাদের হাসিখুশি জীবন কষ্টে পরিনত হয়। কারণ তারা জানত বন্ধুত্বের মর্যাদা বুঝতে তারা একে ওপরের সুখ দুঃখ অনুভব করতে পারত এবং তারা বুঝতে পেরেছিল, বন্ধুত্বের থেকে বড়ো সম্পদ তাদের জীবনে কিছুই না।

> **“আমার সব থেকে ভালো বন্ধু হল আয়না, কারণ আমি যখন কাঁদি তখন সে হাসে না”।**
>
> **— চার্লি চ্যাপলিন**

স্বপ্ন যাত্রী

সৌভিক সেন
দশম শ্রেণি, খ-বিভাগ, ক্রমিক সংখ্যা-39

ভোরের আলোয় যখন পৃথিবী জাগে,
নতুন দিনের স্বপ্ন চোখে লাগে।
বইয়ের পাতায় জ্ঞানের আলো জ্বলে,
আজনাকে জানার নেশা মনে দোলে।

গণিতের ধাঁধা, বিজ্ঞানের সূত্র,
ইতিহাসের পাতায় কত শত সূত্র।
কবিতার ছন্দে হারায় দিশা।
ভবিষ্যতের পথ খুঁজে ফেরে আশা।

কখনো বা মন চায় উড়তে দূরে,
মেঘের সাথে মিশে যেতে নীল অদূরে।
কখনো বা মনে হয়, সব কঠিন বড়,
তবুও হার মানি না, এগিয়ে চলি আরও।

বন্ধুদের সাথে পথ চলা অবিরাম
হাসি গল্পে কাটে সব ক্লান্তি, বিরাম।
শিক্ষকের কথা মনে বাজে সুরে,
আলোর দিশা দেখান তিনি দূরে।

একদিন হয়তো সব হবে সত্যি,
স্বপ্নগুলো পাবে নতুন মুক্তি।
এই পথ চলা, এই শেখা, এই আশা
গড়ে তুলবে এক নতুন ভাষা।

কাকে বলব জেন জেড

সোমনাথ সাধুখাঁ (সহ শিক্ষক)

কিছুদিন আগে একটা ট্রেনিং হচ্ছিলো। বর্তমানের একটু পাজি, একটু নিয়ম না মানা কিন্তু লিটল জিনিয়াস বাচ্চাদেরকে নিয়ে। বকে বকে বা ধমকে তো তাদের আর আজকাল ক্লাসে আটকে রাখাই দায়। আবার যে কোনো কিছুর এক্সপ্লানেশনে যেন তারা এক কাঠি এগিয়ে। মাঝে মাঝে টিচারেরাই তাক লেগে যায়। হাঁ করে তাকিয়ে থাকতে হয়। নিজেরাই ভাবনায় পড়ে যাই, আরে এমন করে আমরা ভাবিনি তো। কারো কারো কাছে এসব চরম দুঃসাহস বা বেয়াদপির পর্যায়েও পড়ে। আগের দিনে ছোটোদের মুখে আজগুবি প্রশ্ন শুনলে, বাজে বকছিস বলে, তাড়িয়ে দিত সবাই। কোনো সমাধান বা উত্তরই পাওয়া দায় ছিলো। কিন্তু এখনকার বাচ্চাদের কি আর তা লাগে? তাদের তো বড়দেরকে জিজ্ঞাসা করারও প্রয়োজন পড়ে না। তাদের মাথায় প্রশ্ন আসা মাত্র দরকার শুধু একটা ক্লিক। ব্যস এক ক্লিকেই মিঃ গুগল বা ইউটিউব সদা ও সর্বদা প্রস্তাত আছেন তাদের জন্য, অক্লান্ত অপরিশ্রমে সকল উত্তর নিয়ে। বর্তমানে স্কুলের এই বাচ্চাদের বড় অংশ Generation Z.

জেন-জেড বা জেনারেশন জেড কারা? আর কেনই বা তাদের নিয়ে এত আলোচনা? ফোর্বসের এক আর্টিকেলে বলা হয়েছে, সহস্রাব্দের পরের প্রজন্ম ও জেন-আলফার আগের প্রজন্মা হলো জেন-জেড। একটু সহজ করে বললে, ১৯৯৭ (মতান্তরে ১৯৯৫) থেকে ২০১২ (মতান্তরে ২০১০) সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত জন্ম, তারাই জেন-জেড। অর্থাৎ জেন-জেডের বয়স এখন ১২ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে। অন্যদিকে ২০১০ বা ২০১২ সালের পর জন্ম নেওয়া শিশু-কিশোরদের আলফা-জেনারেশন ধরা হচ্ছে। জেন-জেড প্রজন্মের প্রধান বিশেষত্ব হলো—তারা 'ডিজিটাল নেটিভ'-এর প্রথম প্রজন্ম। যারা ইন্টারনেট ছাড়া পৃথিবীকে ভাবতে পারে না। এই প্রজন্ম করোনা মহামারি ও জীবনযাত্রার ব্যয়ের সংকটকে খুব কাছ থেকে দেখে দেখেছে। যা তাদের ব্যক্তিত্ব ও মূল্যবোধে গভীর প্রভাব ফেলেছে।

টেকনোলজি-ফ্রিক এই প্রজন্মের প্রতিদিনের অভ্যাসের তালিকায় স্থান পেয়েছে স্মার্ট গ্যাজেটস। কথা বলার জন্য মোবাইল ফোন এখন শুধু যোগাযোগের মধ্যেমই নেই, বরং স্মার্টফোনের স্মার্ট ব্যবহারেও তারা অভ্যস্ত। ফোন ক্যামেরায় শর্টফিল্ম তৈরির ট্রেন্ডও এসেছে। এছাড়া গুগল ম্যাপ, ডেইলি নোটপ্যাড, নেভিগেশন কিংবা লাইভ টিভির মতো নিত্যনৈমিত্তিক ব্যবহার এখন খুব সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। তারা নিজেদের প্রকাশ করতে চায় নিজেদের মতো করেই।

জেন-জেড এর কিছু উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য—

প্রযুক্তির সাথে গভীর সম্পর্ক :

- জেন জেড-এর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো প্রযুক্তির সঙ্গে তাদের গভীর সম্পর্ক।
- তারা ছোটবেলা থেকেই ইন্টারনেট, স্মার্টফোন এবং সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করতে অভ্যস্ত। শর্টফিল্ম বানাতে এর অত্যন্ত দক্ষ— হাতের ফোন দিয়েই সেটা তৈরি করে ফেলে।

• অনেকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে (AI) নিয়ে চিন্তিত হলেও, জেন জেড প্রজন্ম একে একটি সহায়ক শক্তি হিসেবে দেখেছে।

• সংবাদপত্র, টিভি, খেলা দেখা, গান শোনাসহ প্রায় সবকিছুই অনলাইনে সেরে ফেলাতে তারা বেশি আগ্রহী। একটু অদ্ভুত ব্যাপার হলো, এদের অনেকেই ফটোশপের বিরুদ্ধে। এই বিরুদ্ধাচরণ মূলত খুঁত ঢাকার ব্যাপারে।

• জেন-জেড প্রজন্মকে গেমিং প্রজন্ম বলা যেতে পারে। ফোর্বসের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এই প্রজন্মের ৭৫ শতাংশ অনলাইনে গেম খেলে।

সামাজিক ও রাজনৈতিক সচেতনতা :

• জেন জেড সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে অত্যন্ত সচেতন।

• তারা দুর্নীতি, বর্ণবাদ, এবং অন্যান্য সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে সোচ্চার।

• অনেক দেশে, তারা প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী ভূমিকা পালন করেছে, যা তাদের হতাশা ও সচেতনতার প্রতিফলন।

• জলবায়ু পরিবর্তন এবং পরিবেশগত সমস্যাগুলি তাদের উদ্বেগের অন্যতম প্রধান বিষয়।

• এদের অনেকেরই হাতে যথেষ্ট টাকা। এই আয়ের বড় উৎস সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম। সামাজিক মাধ্যমকে তার অর্থ আয়ের প্ল্যাটফর্ম হিসেবে বেছে নিয়েছে। সেখানে ব্যবসা করছে, ইনফ্লুয়েন্সার হচ্ছে, ভিডিও কনটেন্ট বানাচ্ছে।

• Plant Based খাবার, ইন্টারন্যাশনাল খাবার অর্থাৎ কন্টিনেন্টাল, গ্লোবাল কুইজিন, কাস্টমাইজ খাবার পছন্দ করে বেশি।

• খাবার খেলে ছবি তুলবেই, সে সোশ্যাল মিডিয়াতে দিক বা না দিক। এরা খুব স্বাস্থ্য সচেতন, যেকোন কিছুতেই ব্র্যান্ডেড জিনিস পছন্দ যেমন একটা পিৎজা খেতেও কোনো ব্র্যান্ড লাগে এদের।

• এই প্রজন্মের প্রেম এখন একেবারে ‘Netfix সিরিজ’ — প্রতিটা এপিসোডের আলাদা নাম!

শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্র :

• জেন জেড তাদের শিক্ষার জন্য অনলাইন রিসোর্স ব্যবহার করতে বেশি পছন্দ করে।

• কর্মক্ষেত্রে, তারা নমনীয়তা এবং কাজের একটি ভালো ভারসাম্য আশা করে।

• তারা নিজেদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং নতুন প্রযুক্তি শেখার ব্যাপারে আগ্রহী।

ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ এবং সম্ভাবনা :

• বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তন, আর্থিক অনিশ্চয়তা এবং মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যাগুলো জেন জেড প্রজন্মের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ।

• একই সময়ে, তারা তাদের উদ্ভাবনী ক্ষমতা, প্রযুক্তি জ্ঞান এবং সামাজিক সচেতনতার মাধ্যমে এই চ্যালেঞ্জগুলি মোকাবিলা করার সম্ভাবনা রাখে।

• তারা নতুন ভবিষ্যৎ গড়তে এবং একটি উন্নত ও ন্যায়সঙ্গত বিশ্ব তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

• ফোর্বসের প্রতিবেদন অনুযায়ী, জেন-জেড প্রজন্মের ৩৮ শতাংশ দেশ-বিদেশে ঘোরার সুযোগ খোঁজে।

জেন জেড-এ জীবনযাত্রায়-আচরণে ব্যবহৃত কিছু পরিচিত শব্দবন্ধ আজকের নব্য প্রজন্মের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয়। সেগুলোর সঙ্গে সিনিয়রদেরও পরিচয় করা রাখা উচিত।

(1) Soft Launch > যখন কেউ relationship শুরু করেছে, কিন্তু হালকা ইঙ্গিত দেয় — যেমন সোশাল মিডিয়াতে হাতের ছবি, কফি কাপ দুটো, ছায়া ইত্যাদি! জেন ডেজ বলে থাকে — 'ওর স্টোরিতে কারো হাত দেখা গেল — soft launch চলছে!'

(2) Hard Launch > কোনো বিষয়ে (প্রধান প্রেম) একেবারে ধামাকা ঘোষণা — couple photo, caption : 'my person' 'সে অবশেষে ওকে ট্যাগ করে পোস্ট দিয়েছে hard launch!'

(3) Cuffing Season > শীতের সময় (বিশেষ করে অক্টোবর-ফেব্রুয়ারি) যখন সবাই হঠাৎ relationship খোঁজে, ঠান্ডায় cuddle করার সঙ্গী চাই। সোশাল মিডিয়াতে পোস্ট — 'শীত এলেই inbox গরম — cuffing season শুরু!'

(4) Thirst Launch (বা Thirst Trap) > এমন পোস্ট বা ছবি দেওয়া, যা ইচ্ছে করে attention টানবে — usually attractive, to get DMs। এদের মনের ভাবটা এরকম — 'নতুন DP টা একদম thirst launch — সবাই fire react দিচ্ছে!'

(5) Dry Texting > যখন কেউ এক শব্দের রিপ্লাই দেয় — যেমন : 'hmm', 'ok' 'k' — কোনো effort নেই। জেন জেড মনে করে 'আমি paragraph লিখলাম, সে শুধু' 'yeah' বলল — dry texting!'

(6) Slow Fade > কেউ ধীরে ধীরে যোগাযোগ কমিয়ে দেয়, সরাসরি না বলেই দূরে সরে যায়। 'আগের দিনে 10 বার কথা হত, এখন 3 দিনে একবার — slow fading!'

(7) Stashing > কাউকে ডেট করলেও, বন্ধুবান্ধব বা পরিবারকে জানায় না — relationship লুকিয়ে রাখে। একজন জেন জেড আর একজনকে জানায় 'সে বলে ভালোবাসে, কিন্তু আমাকে কাউকে দেখায় না — stashing!'

(8) Benching > ব্যাকআপ প্লেয়ার হিসেবে রাখা — সুযোগ পেলে ব্যবহার করবে, না হলে নয়। 'ওর টাইম না হলে আমাকেই মনে পড়ে—benching!'

(9) Ghosting > হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে যাওয়া, কোনো explanation ছাড়াই — vanish। 'গতকালও ভালো কথা হচ্ছিল, আজ ব্লক করে দিল—ghosted!'

(10) Breadcrumbing > সামান্য আগ্রহ দেখিয়ে, কিন্তু কিছু সিরিয়াস না করা—শুধু আশায় ঝুলিয়ে রাখা। 'তিনদিনে একবার রিপ্লাই দেয়, কিন্তু দেখা নয় — breadcrumbing!'

(11) Orbiting > কথা বলে না, কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়ায় stalk করে—লাইক, ভিউ, react সব করে। 'ভালোবাসা শেষ কিন্তু story-তে প্রথম ভিউ—orbiting!'

(12) Delulu (Delusional) > যখন কেউ বাস্তবতা ভুলে, নিজের কল্পনায় relationship বানিয়ে ফেলে। 'সে শুধু হাসল, আমি ভেবেছি ও প্রেমে পড়েছে—delulu mode on!'

(13) Rizz (Charisma বা fitting skill) > কারো সাথে কথা বলে charm ছড়িয়ে দেওয়া, smooth flirting skill। 'ওর Rizz একদম next level — সবাই মুগ্ধ!'

(14) Situationship > যখন দু'জন একসাথে থাকে কিন্তু clear করে না— 'আমরা officially কী?' এর উত্তর—'না প্রেম, না বন্ধুত্ব—pure situationship!'

(15) Cushioning > নিজের current relationship রেখে অন্যদের সাথে হালকা ফ্লার্ট করা, future backup হিসেবে। 'commitment আছে, তবুও DMs খুলে রাখে—Cushioning!'

(16) Zombieing > আগের মতো হঠাৎ ফিরে আসা, যেন কিছুই হয়নি। '6 মাস পর 'miss you' — zomble alert!'

(17) Gaslighting > এমনভাবে mainpulate করা যেতে অপর ব্যক্তি নিজের অনুভূতি নিয়ে সন্দেহ করে। 'সে সবসময় বলে আমারই ভুল— gaslighting classic.'

(18) Love Bombing > শুরুতে অতিরিক্ত ভালোবাসা দেখানো, পরে আচমকা দূরে সরে যাওয়া। 'শুরুর দিকে দিনরাত মেসেজ, এখন একদম ঠান্ডা— love bombing!'

জেনারেশ জেড-এর এই বৈশিষ্ট্য এবং পরিবর্তনগুলোর মধ্যে যেমনই রয়েছে নতুন সম্ভাবনার দিক, তেমনই কিছু ক্ষতির দিক এড়িয়ে যাবার উপায় নেই। প্রথম, কালচার পরিবর্তনে তাড়াহুড়াজনিত কারণে অনেক ক্ষেত্রেই পাকিয়ে যাচ্ছে জগাখিচুড়ি। সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যগত চর্চা বেশ বাধার সম্মুখীন। এখনকার ছেলেমেয়েরা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অভ্যস্ত হলেও আদতে তাদেরকে বিচ্ছিন্নই বলা যেতে পারে। এখন আড্ডা, হইহুল্লোড় কিংবা মাঠে খেলাধুলো-বিমুখ ছেলেমেয়ের সংখ্যা নেহাতই কম নয়। তারা ভার্চ্যুয়াল জগতে অনেক বেশি সম্পৃক্ত। একই সঙ্গে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়াটাও একটা বড় সমস্যা হয়ে উঠেছে। ভার্চ্যুয়ালি তারা অনেক এগিয়ে গেলেও বাস্তবতায় পিছিয়ে পড়ার কারণে হতাশার শিকার হচ্ছে। মানবিক সম্পর্কের অবনতির পেছনেও এর দায় রয়েছে। প্রয়োজন না থাকলেও প্রায় সারা দিন তারা অনলাইনে 'অ্যাকটিভ'। যুক্তরাষ্ট্রে ৫৯ শতাংশ কিশোর-কিশোরী অনলাইনে হয়রানির শিকার। এর ভেতরে রয়েছে অপমানজনক কথাবার্তা, গালিগালাজ, গুজব ছড়ানো, শারীরিক হুমকি প্রদান এবং অপ্রত্যাশিত ও ব্যক্তিগত ছবি প্রকাশ। নেতিবাচক দিকগুলো বাদ দিলে এই প্রজন্মের অর্জনটাও কম নয়। সুতরাং, 'জেড' জেনারেশনের গতিশক্তির সঠিক প্রয়োগটা জরুরি।

এখন তাই এই জেড জেনারেশনের সাথে সাথে ওয়াই জেনারেশন বা এক্স জেনারেশনের অভিভাবক বা শিক্ষকদেরকেও আপডেট হতে হবে। এসেছে নতুন শিশু তাই বলে স্থান ছেড়ে দিলেই শুধু চলবে না। সেই স্থানে বসবার জন্য যোগ্য করে গড়ে তোলার দায়িত্বটাও কিন্তু আমাদের।

বৃষ্টি নামুক আকাশ জুড়ে

পশুপতি পাল (সহ-শিক্ষক)

তপন তাপে তপ্ত ধরা
তাকায় এখন মেঘ পানে;
সমীর-শ্বাসে অগ্নি মিশে
পরান 'পরে শুধু হানে!

আগুন নামে নদীর বুকে
হাহাকার ওই কানায় কানায়;
নিঝুম চোখের স্বপ্ন বোনে
বিহগ এখন ক্লান্ত ডানায়!

অলস দুপুর পুড়ছে একা
ডাহুক ডাকে মৃদু স্বরে;
নীরবতা আয়েশ ক'রে
সময় কাটায় পথের 'পরে!

ঝর্ণা নামুক পাহাড় চিরে
ধরার বুকে প্রবল বেগে;
শান্তি বারি বয়ে যাবে
হরিত ক্ষেত্র উঠবে জেগে!

এক আকাশ মেঘ নামুক এখন
ভালোবাসার অলীক সুখে;
যেমন করে সাগর মেশে
সৈকতের ওই নীরব বুকে!

RAJIB JAISOWARA
IXA, Roll - 3

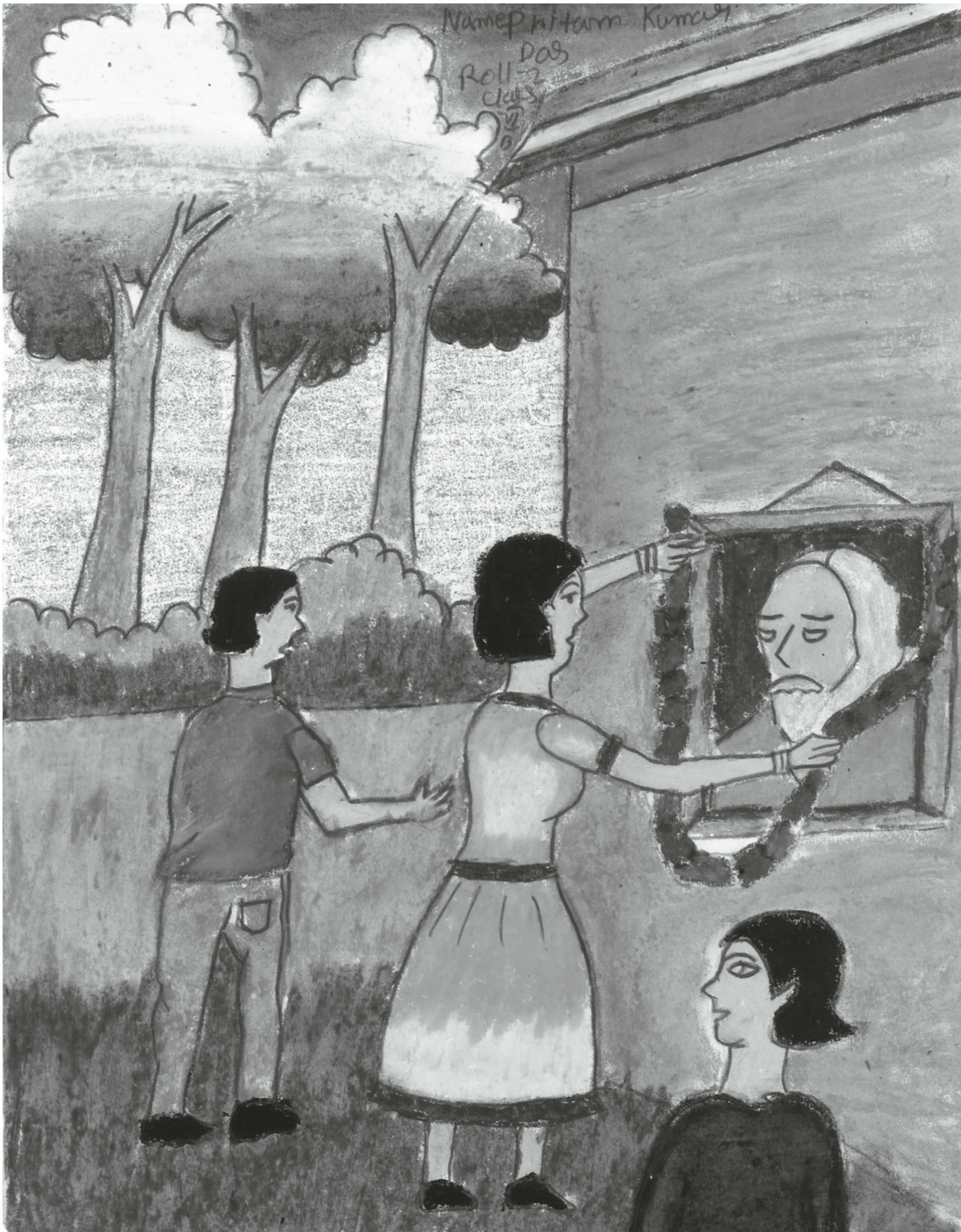

PRITAM KUMAR DAS
VIB, Roll - 2

SWASTIK ROY
XI, ARTS, Roll - 3

রাতের কথা

রাজীব জয়সোয়ারা
নবম শ্রেণি, ক-বিভাগ, ক্রমিক সংখ্যা-3

মধ্যরাতে চাঁদের আলোয়
শিশির গড়ায় ঘাসের পাতায়,
নদীর জল ঝলমল করে
বেঁকে যায় ওই পাহাড় চূড়ায়।।

ঝিঁ ঝিঁ পোকা সুরে ডাকে
জুঁই মালতির গন্ধে মাতে,
লক্ষ্মী পেঁচা কোটর ছেড়ে
যাচ্ছে ওই ধানের ক্ষেতে।।

রাতের গোড়া শীতল বাড়ে
বাতাসেতে পাতা নড়ে,
জোনাকিরা ঝলমল করে;
শ্রমিকরা রাতে বাড়ি ফেরে।।

দূরের ওই জঙ্গলেতে
শিয়াল ডাকে হুক্কা-হুয়া।
রাতের স্নিগ্ধ নিস্তব্ধতায়
শোঁ শোঁ করে বয়ে হাওয়া।

আড্ডা

সৌক্তিক দাস

দশম শ্রেণি, খ-বিভাগ, ক্রমিক সংখ্যা-16

মানুষ কেবল কর্মের দাস নয়। মানুষের মনঃপ্রকৃতি কর্মের অবসানে অসবর খোঁজে। এই অবসর যেমন তার কর্মের ক্লান্তি দূর করে হৃদয়কে তেজ ও স্ফূর্তিতে পরিপূর্ণ করে তোলে, তেমনি পুনরায় কর্মের জন্যও তাকে অনুপ্রাণিত করে। এককথায়, অবসর বা বিশ্রাম মানুষকে নতুনভাবে জীবনের সঙ্গে চলার শক্তি দান করে, অবসরযাপন হল ভারমুক্ত জীবনের স্বচ্ছন্দ উপভোগ।

মানুষ নানা ভাবেই অবসর যাপন করে। তার মধ্যে অন্যতম হল আড্ডা। কয়েকজন মিলে নির্দিষ্ট স্থানে যে আলাপ-আলোচনা বা গল্পগুজব করে, তাকে আড্ডা বলে। আড্ডা মানুষের জীবনকে সংকীর্ণ গন্ডী থেকে বৃহৎ এক আনন্দময় মাসিক পরিধিতে পরিব্যাপ্ত করে দেয়। আড্ডা জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ। ছেলে, বুড়ো, কবি-সাহিত্যিক, মনীষী সবাই আড্ডা প্রিয়। আড্ডা মানুষের চিরসঙ্গী।

প্রাচীনকালের মানুষেরা দলবদ্ধভাবে শিকারির জীবনযাপন করত। সারাদিন পাহাড়ে পর্বতে অরণ্যে ঘুরে ফিরে সন্ধ্যায় বাসস্থানে ফিরে আড্ডা জমাত। দিনের কাজকর্মের আলোচনার মাধ্যমে অবসর যাপন করত। পরের দিনের কাজকর্মের পরিকল্পনা নিত। এ যুগে আমরা সাধারণ শ্রমিক কিংবা কৃষক শ্রেণির মানুষের সেইরকম কাজকর্মের শেষে নিজেদের গৃহে লোকজনেদের নিয়ে আড্ডা জমাতে দেখি। তাদের আড্ডা তাদের দৈনন্দিন কাজকর্মের মধ্যে সীমাবদ্ধ। স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা ক্লাসের ফাঁকে তাদের পড়াশুনো ও প্রতিষ্ঠানের নানা বিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনায় আড্ডা জময়।

কবি, সাহিত্যিক ও দার্শনিক প্রভৃতি অসাধারণ মনীষীদের আড্ডা ভিন্ন প্রকৃতির। তাদের আড্ডা চলে পারস্পরিক নানা চিন্তাভাবনার পর্যালোচনায়। সাহিত্যিকদের মধ্যে আড্ডা নামক বিষয়টি বিশেষভাবে সুপ্রচলিত। সাহিত্য ও দর্শনের নানা বিষয় নিয়ে তাদের আড্ডাটি জমজমাট হয়ে ওঠে। টুকরো টুকরো নানা বিষয় নিয়ে একান্ত ঘরোয়া অন্তরঙ্গ পরিবেশে তাদের আড্ডা বেশ মনোরম। সেই আড্ডায় অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের স্বরূপটি উদ্‌ভাসিত হয়ে ওঠে। সাহিত্যিকদের আড্ডা নিয়ে অনেক পুস্তক রচিত হয়েছে।

আড্ডার পরিবশেটি চমৎকার। দশ-বারো জন মিলে সাহিত্যিকদের আড্ডা জমে কফি হাউস বা কারুর বাসগৃহে। আড্ডার ভাষা একান্ত সহজ ও আটপৌরে। আড্ডায় পূর্বনির্ধারিত কোনো বিষয় থাকে না। আড্ডা জীবনের মাধুর্যমন্ডিত এবং সুন্দর অভিব্যক্তি। সহজ মানবিকতার গুনে অড্ডা অনন্য।

নববর্ষের প্রার্থনা

শ্রীপরিতোষ বণিক
(অফিস করনিক)

বৈশাখের প্রথম দিন বাঙালীর এক শুভদিন
নববর্ষ হল তারি নাম।
আনন্দ আজ ঘরে ঘরে পুলকিত এ অন্তরে
ঠাকুরকে জানাই প্রণাম।।
পুরাতন দুঃখের স্মৃতি আজ সব করি ইতি
নব বরষের পানে চাই।
হয়ে আজি এক মন স্মরি তাঁর শ্রীচরণ
কৃপাকণা যদি তাঁর পাই।।
তিনি প্রভু দয়াময় কেহ বলে কৃপাময়
নানা জনে নানা ভাবে ডাকে।
স্নেহময়ী মা সারদা সবার চরণে লুটি তাহার
চিরদিন মনে যেন থাকে।।
সুখে দুখে সমভাবে মিলে মিশে থাকি সবে
কবে যে তাঁদের দেখা পাবো।
সার্থক হবে আসা শেষ করে কাঁদা হাসা
আপন আলয়ে ফিরে যাবো।।

।। জয় কৃপাময়ী মা সারদা।।

এক অলৌকিক ঘটনা

সমুদ্র রায়
দ্বাদশ শ্রেণি, আর্টস-বিভাগ, ক্রমিক সংখ্যা-39

সালটা তখন 2019। আমি তখন সবে সবে ফ্রি ফায়ার খেলা শুরু করেছি। তখনকার সময়ে ফ্রি ফায়ারে কোন মেয়ের ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাওয়া সোজা নয়। খুব কম মেয়ে ছিল যারা ফ্রি ফায়ার খেলত। 22শে ফেব্রুয়ারী। হঠাৎ সেই দিনে গেমে একটা মেয়ের সাথে আমার আলাপ হল। তার নাম ছিল Jasemin। তার গলার মধুর স্বর আমার মনে জায়গা করে নিল। এইভাবে বেশ কয়েকদিন আমরা একসাথে গেম খেলতাম। তবে আমি তাকে কোনোদিনো দেখিনি। তবুও তার প্রেমে পড়তে আমার বেশি সময় লাগলো না। এইভাবে বেশ কয়েকদিন গেম খেলার পর একদিন হঠাৎ Jasemin-এর গলার স্বর ছাড়াও অন্য কারোর স্বর পাওয়া গেল। একটা ছেলের গলার স্বর সেই ছেলেটি Jasemin কে বলল, 'দিদি এবার খেতে বসো' মা ডাকছে। তখন আমি বুঝলাম যে এটা Jasemin এর ভাই। কিন্তু আমি অবাক হলাম যখন Jasemin তার ভাইকে কোন উত্তর দিল না। আরও চার-পাঁচ দিন এই একটা ঘটনা লক্ষ্য করলাম। তারপর আমি হঠাও একদিন Jasemin-কে জিজ্ঞাসা করলাম। তোমার ভাই যখন তোমায় ডাকে তুমি কিছু উত্তর দাও না কেন? সাথে সাথে Jasemin-এর কান্নার শব্দ পাওয়া গেল। বেশ কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর Jasemin বলল এটা কী করে সম্ভব? আমার ভাই দু-সপ্তাহ আগেই মারা গেছে। এটা শোনার পরই তখন আমার পায়ের তলা থেকে মাটি যেন সরে গেল। হাত-পা ঠান্ডা হয়ে গেল আমার। মোবাইল হাত থেকে ছিটকে পড়ে গেল এবং সাথে সাথে আমি অজ্ঞান হয়ে গেলাম। আমার যখন জ্ঞান ফিরল তখন ঠিক রাত 10টা। সেই রাতে আমার আর সারারাত ঘুম আসেনি। এরপর থেকে আমি যখন Jasemin-এর সাথে গেম খেলি সে আমায় কিছু বলতো না, শুধু কাঁদতো।

দিনটা ৪ই মার্চ। সেদিন খাওয়া শেষ করে রাতে ঘুমাতে নিজের ঘরে গেলাম। সেদিন রাতে এক স্বপ্ন দেখলাম। সেটা যেন আমার হৃদয়ের হৃদস্পন্দন বাড়িয়ে দিল। সেই স্বপ্নে আমি যাকে দেখলাম, সেই ছেলেটি, যার বয়স ছিল 8 বছর তার নাম Rahul। যে Jasmine-এর ভাই। তারা দেহরাতে থাকত। Rahul মারা যাওয়ার পর তার দিদি প্রতিটি মুহূর্তে যন্ত্রনায় মরত এবং এই মৃত্যুর জন্য তার দিদি নিজেকে দোষ দিত অর্থাৎ Jasemin মনে করত, Rahul-এর মৃত্যুর জন্য সে নিজেই দায়ী। তারপর Jasemin ছাদ থেকে নীচে ঝাঁপিয়ে আত্মহত্যা করল। তখন Rahul স্বপ্নে আমাকে বলে উঠলো জিজু এই কী তোমার ভালোবাসা? যদি তুমি চাইতে তাহলে তুমি আমার দিদিকে কাঁদাতে পারতে? এই স্বপ্ন দেখার পর হঠাৎ ভয়েতে আমার ঘুম ভেঙে গেল। তখন ঠিক করলাম আমায় দেহরাতে যেতে হবে। আমায় জানতেই হবে যে Jasemin এর সাথে কী হয়েছিল। এর কয়েকদিনের মধ্যই আমি দেহরা যাওয়ার জন্য রওনা দিলাম। হাওড়া-দেহরা দুন এক্সপ্রেস ট্রেনে করে যখন দেহরা যাচ্ছিলাম, তখন আমি ট্রেনের মধ্যে অনেক কথা চিন্তা করতে লাগলাম যে Rahul কী করে মারা গেল? কেন Jasemin নিজেকে Rahul এর মৃত্যুর জন্য দায়ী মনে করছে? এরপর ট্রেনটি গন্তব্যে এসে পৌঁছলো। ট্রেন থেকে নামতেই শুনতে পেলাম সবাই সবাইকে 'Happy New Year' বলছে। আমি একটু অবাক হলাম, মোবাইলে তারিখ দেখতেই ঘাবড়ে গেলাম। দেখলাম তখন 1 জানুয়ারী,

2019। ভাবলাম ট্রেনে উঠলাম 22শে মার্চ কিন্তু এখন 1 জানুয়ারী। তখন আমি বুঝে গেলাম যে আমাক কী করতে হবে। আমি স্টেশনের বাইরে বেড়িয়ে মন্দিরে গেলাম এবং পুজো দিলাম। আমি ভগবানকে ধন্যবাদ জানালাম আমাকে সময়ের পূর্বে নিয়ে যাওয়ার জন্য। যেন মনে হচ্ছে এটা একটা রূপকথার গল্পের মত আমি Time Machine করে বর্তমান সময়ের আগে এলে আমার সঙ্গীকে রক্ষা করব। দেহরাতে পৌঁছে আমার উদ্দেশ্য ছিল Jasemin এর বাড়ি খুঁজে বের করা। সেটা করতে আমার বেশি সময় লাগল না। খুব সহজেই তার বাড়ির খোঁজ পেলাম। বাড়ির বাইরে দু-জন পুরুষ একে অপরের সাথে কিছু কথা বলছে। আমি একটা গাছের পেছনে আড়ালে দাঁড়িয়ে তাদের কথা শোনার চেষ্টা করলাম। তাদের কথা শোনার পর বুঝতে পারলাম এই ব্যক্তির নাম Ashish, ইনি Rahul ও Jasemin এর বাবা ও তিনি তার বন্ধুর সাথে আলোচনা করছেন। আমি লুকিয়ে তাদের কথা শোনার পর বুঝলাম Ashish, এর বড় টাকার লোভ যে নিজেরে মেয়েকে বিক্রি করতে চাইছেন টাকার জন্য। এইসব বিষয়ে Rahul জেনে গিয়েছিল তাই এখন তাদের উদ্দেশ্য ছিল Rahul-কে শেষ করা। আমি তখন ভাবলাম যে বাবার কর্তব্য মেয়ের ভবিষ্যৎ গড়ে তোলা। কিন্তু ইনি কিছু টাকার জন্য নিজের মেয়ের ভবিষ্যৎ নষ্ট করে দিতে চলেছেন—তার নিজের ছেলেকেও খুন করতে তাঁর হাত কাঁপতে না। হঠাৎই Ashish বলল 'গাছের পিছনে কে, সামনে এসো বলছি'। আমি তখন সরাসরি তার সামনে এসে দাঁড়ালাম। তখন সে আমাকে প্রশ্ন করলেন 'তুমি কে'? 'তুমি এখানে কী করছো?' 'আগে তো এখানে তোমার কখনও দেখিনি, থাকো কোথায়?' আমি উত্তর দিলাম — এসব আপনার না ভাবলেও চলবে না। এবং আমি বললাম আমি আপনাকে দুটো Option দেবেন। (i) আপনি যে লক্ষ্যে এসেছেন তাতে আমি আপনাকে সাহায্য করব। এর ফলস্বরূপ আপনাকে আমায় 40% দিতে হবে এবং 60% আপনি রাখবেন। (ii) আপনার এইসব ঘটনা আমি মোবাইলে Video করে রেখেছি। এটা পুলিশের হাতে তুলে দেব। এইসব শুনে Ashish এর প্রথম Option ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণ করার উপায় ছিল না। Rahul এর বাবা আমাকে তার সব পরিকল্পনা বললেন যে কীভাবে Rahul কে মারবেন। কিন্তু আমার উদ্দেশ্য ছিল দুজনকে বাঁচানো। আমি Rahulকে পালাতে সাহায্য করলাম। তখন Ashish আমার সামনে বন্দুক নিয়ে দাঁড়ালেন এবং আমাকে এবং Rahulকে মারতেই যাবে। ঠিক সেই সময় হঠাৎ পিছন থেকে কে Ashish-কে গুলি করল ও আমার পায়ের সামনে পড়ে মারা গেল। Rahul তখন দিদি বলে তার কাছে চলে গেল। তখন আমি বুঝলাম এই সেই Jasemin। এই প্রথমবার আমি তাকে সামনে থেকে দেখলাম। এতদিন আমি তার সাথে Free Fire খেলেছি। তার গলার স্বরটাই শুধু চিনেছি। দেখলাম তার গায়ের রং ফ্যাকাশে।

এরপর আমি দেহরা থেকে ফিরলাম এবং কলকাতা এসে তারিখ দেখলাম 22 মার্চ। আমি ভাবলাম যখন আমি দেহরা গেলাম তখন আমি অতীতে চলে গেলাম। কিন্তু যখন ফিরলাম তখন সময় আমার জন্যে থমকে দাঁড়িয়ে আছে। অর্থাৎ 'ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যই করেন'। কিন্তু এতক্ষন আমি ভাবছিলাম এই গল্পের প্রধান নায়ক আমি। আসলে গল্পের প্রধান নায়ক বা হিরো কে? আমি নাকি Jasemin নাকি Rahul নাকি তার Siblings?

তবে বর্তমান সময়ের পূর্বে যাওয়া ও আবার বর্তমান সময়ে ফিরে আসার রহস্যটা আজানাই থেকে গেল।

ছোট্ট পুকু

অঙ্কন দাস

দশম শ্রেণি, খ-বিভাগ, ক্রমিক সংখ্যা-2

ভেজা হাওয়া খবর দিল
জলের দেশে খামে।
ঝম ঝমিয়ে জলের ফোঁটা
মেঘ ফাটিয়ে নামে।
ছোট্ট পুকু যেই না এসে
পড়তে বসে খাটে;
বৃষ্টি ভেজা ছেলেরা সব
খেলতে গেছে মাঠে।
রান্না ঘরে ঠাম্মা যখন
খুক খুকিয়ে কাশে;
পুকু তখন বই গুটিয়ে
বসে তাহার পাশে।
ঘরের উঠোন পুকুর এখন
ছোট্ট পুকুদের;
সেথায় পুকু আজ ভাসাবে
নৌকা কাগজের।
ঘর জুড়ে তার খেলার সাথী;
পাগল বাদল হাওয়া;
সারাটা দুপুর মাকে পাবে;
স্কুল হবে না যাওয়া।

“বইয়ের মতো বিশ্বস্ত বন্ধু আর নেই”।

— আর্নেস্ট হেমিংওয়ে

তুলনাহীন আকাশ

মহাদেব ভট্টাচার্য
অষ্টম শ্রেণি, ক-বিভাগ, ক্রমিক সংখ্যা-2

আকাশ নীল, বিশাল এক সমুদ্র।
সাদা মেঘ ভাসে তার বুকে, ধূ ধূ করে।
পাখিরা উড়ে যায় উঁচু আকাশে,
সবাই মিলে সুন্দর একটা দৃশ্য।

মেঘের আকার নানা রকম,
দেখতে ভালো লাগে।
আকাশের নীল দিগন্ত,
সাদা মেঘের সঙ্গে মিলে যায়।

আকাশের নীল রঙ যেন শান্ত একটা গান,
মেঘের সাদা রঙ যেন কোমল একটা স্পর্শ।

চাঁদের আলোয় রাত জাগে,
তারার ঝলকানি কে দেখে?
একলা বসে ভাবনায় ডুবে,
মন খুলে কবিতা লেখে।

আকাশে চাঁদ উঠেছে,
মেঘে ঢাকা তার আলো।
তাই একলা ঘরে বসে,
ভাবছি তোমার কথা সারারাত।

হারানো দিনের সন্ধানে

অংশুমান মেয়ুর
দশম শ্রেণি, খ-বিভাগ, ক্রমিক সংখ্যা-7

একদিন গ্রামের ছোট্ট ছেলেটি রাহুল, তাদের পুরানো কাঠের আলমারি খুলে একটি পুরানো ডায়েরি খুঁজে পেল। ডায়েরিটা ছিল তার দাদুর যিনি ছিলেন একজন ভ্রমণপ্রিয় মানুষ। ডায়েরির পাতায় পাতায় ছিল নানা জায়গার বর্ণনা — পাহাড় ও নদী, অরণ্য, আর অজানা সব জনপদ।

রাহুল সেই ডায়েরি পড়ে মুগ্ধ হয়ে গেল। সে সিদ্ধান্ত নিল, দাদুর পদাঙ্ক অনুকরণ করে সেও বেরিয়ে পড়বে অভিযানে। মা-বাবা শুরুতে কিছুটা ভয় পেলেও পরে রাজি হয়ে গেল, কারন, তারা জানত রাহুলে স্বপ্ন বড়।

প্রথমে সে গেল দার্জিলিং। ডায়েরিতে দাদু লিখেছিলেন, "এই পাহাড়ের কুয়াশার যেন সময় থমকে দাঁড়ায়।" রাহুল সত্যিই অনুভব করল, যেন সে দাদুর চোখ দিয়ে প্রকৃতিকে দেখছে।

এরপর সে ঘুরে এল সুন্দরবনে, যেখানে দাদু লিখেছিলেন, "গহীন এই বন যেন জীবনের রহস্যময়তা শেখায়।" বনের নিস্তব্ধতা, বাঘের হালকা পায়ের ছাপ আর নদীর ঢেউ রাহুলকে নতুন এক জগতের খবর দিল।

সবশেষে সে গেল এক ছোট্ট গ্রামে, যেখানে দাদু একসময় কিছুদিন শিক্ষকতা করেছিলেন। গ্রামের বয়স্ক মানুষরা রাহুলকে দেখে বলে উঠল, "তুই কি হরিপদ মাস্টারের নাতি নাকি? হুবহু ওনার মতো দেখাচ্ছে!"

রাহুলের চোখে জল চলে এল। সেই মুহূর্তে সে বুঝল, সে শুধু একটা অভিযান করেনি, সে যেন সময়ের ভিতর দিয়ে হেঁটে গেছে, হারানো দিনগুলিকে ছুঁয়ে এসেছে।

"ট্রেজার আইল্যান্ডে জলদস্যুদের লুটের চেয়ে বইগুলিতে আরও বেশি ধন রয়েছে"।

— ওয়াল্ট ডিজনি

প্রিয় অভিমান

প্রীতি মন্ডল
একাদশ শ্রেণি, বাণিজ্য-বিভাগ, ক্রমিক সংখ্যা-73

অকাল শ্রাবণে
আমার হৃদয়ে—
‘তোমার’ অসুখ,
হাওয়ায় হাওয়ায়
ভেসে উঠল
সেই চেনা মুখ।
কবি কলম
বুনছে সবারে!
প্রথম প্রেমের গান,
সেই সুরেতে
লুকিয়ে আছে
তোমার ছদ্মনাম।।
রাতের আকাশ
ঢাকছে যখন
নীরব চাঁদের দাগ,
আবছায়াতে—
শূন্য মনে
বাড়ছে তখন রাগ।।

বাংলার ঋতু

ধ্রুব ঘোড়ই
অষ্টম শ্রেণি, খ-বিভাগ

গ্রীষ্মকালে গরম ভারী,
হচ্ছে প্রবল তাপ ও খরা।
বর্ষাকালে হয় বৃষ্টি,
নদী, পুকুর সবই ভরা,
শরৎ-এ ফোটে কাশ ফুল,
আসে দুর্গাপুজো।
হেমন্তে পাকে ধান,
গৃহস্থ পায় প্রাণ
শীতে হয় ঠান্ডা প্রচুর,
সবাই কাঁপে ঠক ঠকিয়ে।
বসন্তের রঙিন ফুলে,
প্রকৃতিকে দেয় রাঙিয়ে
ঋতুগুলি নয় মন্দ,
আনে জীবনের ছন্দ।

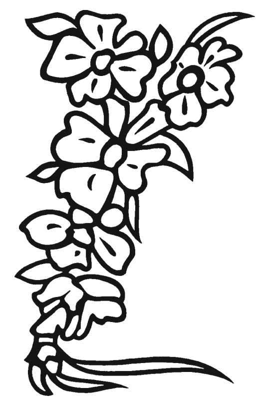

“বই হলো এক অনন্য বহনযোগ্য জাদু”।
— স্টিফেন কিং

অপেক্ষা

শুভম দাস

দ্বাদশ শ্রেণি, বাণিজ্য-বিভাগ, ক্রমিক সংখ্যা-17

— কীরে! আজ এত দেরি করলি?

— আর বলিস নারে, অফিসের এত কাজ। তার উপর জানিসই তো প্রাইভেট সেক্টরগুলো যতটা পারবে খাটিয়ে নেবে উফ!!

— তা অবশ্য ঠিকই বলেছিস।

— তুই তো অনেকক্ষণ এখানে দাঁড়িয়ে বল। ইস রে!! তোকে আজ অনেকক্ষণ অপেক্ষা করালাম।

— হুঁ, ভালো বলেছিস। আমার আবার অপেক্ষা!!! দাঁড়িয়েই তো এখন দিন কাটছে রে।

— হ্যাঁ, তোর লেখক ভাবটা এখনো গেল না।

— আচ্ছা, তোর মনে পড়ে আগের দিনগুলোর কথা? মনে পড়ে ওই গাছটার কথা? সেই টিফিনের টাকা জমিয়ে দুজনে মিলে গাছটা লাগিয়েছিলাম নার্সারি থেকে কিনে।

— হ্যাঁ, মনে পড়ে। ওই পেয়ারা গাছটা আমার কাছে এক স্মৃতিচিহ্ন বলতে পারিস, যা কখনোই ভোলার নয়।

— দিনগুলো বড্ড তাড়াতাড়ি চলে গেল রে! তা এখন আর স্কুলের সামনে দিয়ে ফিরিস নাকি অন্য রাস্তা দিয়ে?

— নারে এখন আর ওদিক দিয়ে ফিরি না। বড্ড একা লাগে ওদিক দিয়ে আসলে।

— একা লাগার কী আছে রে?

— হুম, ঠিকই বলেছিস। একা লাগার কী বা আছে।।

নারে, তাও এখন আর পারি না ওদিক দিয়ে আসতে। মনে হয় কারোর জন্য এক কষ্টকর অপেক্ষা আমায় গিলে খাচ্ছে।

— এখনও এতো কষ্ট পাস তুই?

— হ্যাঁ রে, তুই তো আমার একমাত্র বন্ধু ছিলি। তোর এরকম সিদ্ধান্ত আমি এখনো মেনে নিতে পারিনি রে।

— কী করতাম বলতো তাছাড়া? ছোটো থেকে অনেক কষ্ট করে বাবা-মা পড়িয়েছে। নিজের যোগ্যতায় সবেমাত্র স্কুলের চাকরিটা পেয়েছিলাম। ভেবেছিলাম বোনের বিয়ে দেবো, মায়ের হাঁটুর অপারেশনটা করাবো, বাবা ওষুধের খরচ সব নিজের কাঁধে নেব। কিন্তু পারলাম না রে, কিছু পারলাম না ....

— তা বলে এমন করলি?

— বড়োই দুর্ভাগা আমি জানিস তো! আমার সুখের দিন আসার মুহূর্তেই ক্যানসারের মতো মারণ রোগটা দেখা দিল। আমি জানি, বাবা-মা নিজেদের সর্বস্ব দিয়ে চিকিৎসা করাতো। কিন্তু তাতেও ভালো কিছুই হতো না রে। নিজেকে আর আটকে রাখতে পারলাম না।

— ছাড় রে! তোর উপর আমার অনেক অভিমান জমে আছে। একবারও ভাবলি না আমার কথা। ছেড়ে চলে গেলি। রেখে গেলি আমায় এক বেদনাদায়ক অনন্তকালের অপেক্ষায় ...

— আরে রাগ করিস নারে। সবাই আমায় ভুল বুঝছে, তুই অন্তত ভুল বুঝিস না। সত্যিই আমার কোনো উপায় কি ছিল না রে।

— হুম বুঝলাম।

— অনেকক্ষণ হলো রে, এবার তুই যা। কাল আবার আসবো আমি এখানেই।

— আচ্ছা, আজ তবে যাই রে। তোর প্রিয় টগর টা তবে এই গাছের তলাতেই রাখলাম।

— হ্যাঁ। কাল আবার আসিস। আমি থাকবো তোর অপেক্ষায়।

অপেক্ষা!!! সত্যিই বড়োই অদ্ভুত এই ব্যাপারটা। কারোর পূর্ণতা পায়, তো কারোর অপেক্ষা থেকে যায় অনন্তকালের অপূর্ণতায়। তবু মানুষ এই অপেক্ষাকেই সঙ্গী করে বেঁচে থাকতে চায় কোনো কিছুকে আবার ফিরে পাবার আসায়।

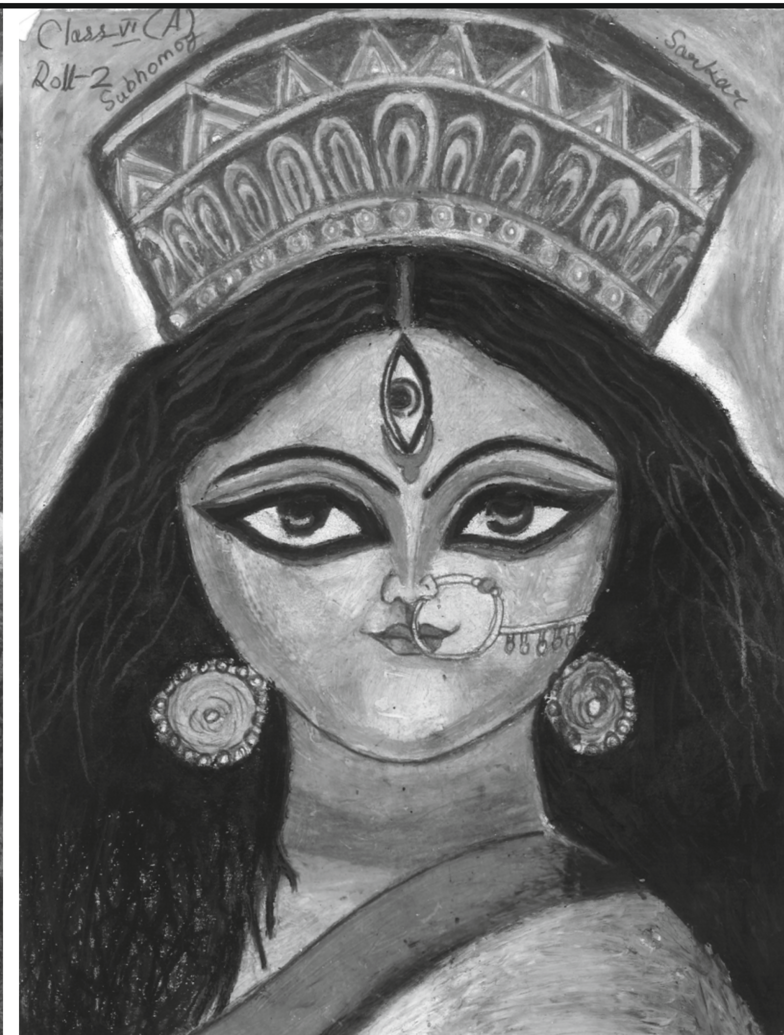

SUBHOMOY SARKAR
VIA, Roll - 2

SWASTIK ROY
XI ARTS, Roll - 2

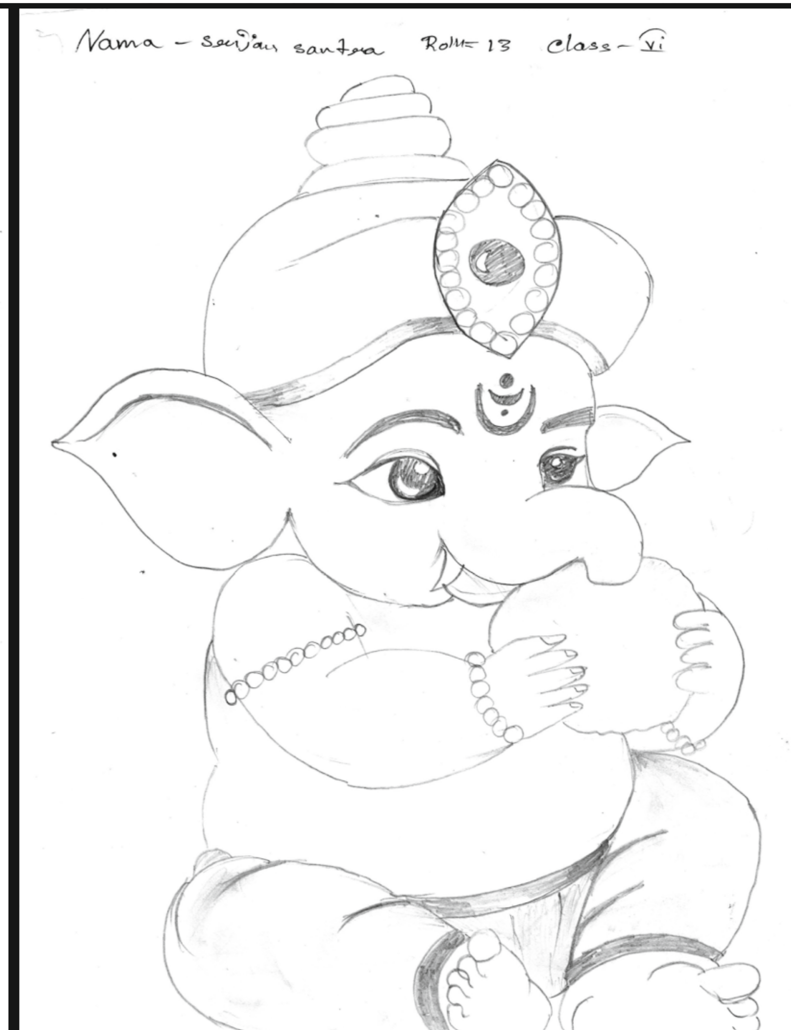

SRIJAN SANTRA
VI, Roll - 13

PRITAM KUMAR DAS
VIB, Roll - 2

SUBHOMOY SARKAR
VIA, Roll - 2

মশা

মানব মাইতি
ষষ্ঠ শ্রেণি, খ-বিভাগ, ক্রমিক সংখ্যা-15

পড়ার সময় মশার কামড়
এ কি ভীষন জ্বালা
কানের কাছে ভোঁ ভোঁ করে
কানটা ঝালাফালা
যতই বলি মাফ কর ভাই
পায়ে তোমার পড়ি
পা ছাড়িয়ে মশা বলে
I am very sorry
আমার নাম মশা
রক্ত খাওয়া পেশা
জন্ম আমার ড্রেনে
বুদ্ধি থাকে ব্রেনে
আমার থেকে বাঁচতে হলে
কয়েল জ্বালাও সবে
ঘুমোতে যাওয়ার আগে
মশারি টাঙাতে হবে।

বৃষ্টির কথা

কৌস্তভ উকিল

দশম শ্রেণি, খ-বিভাগ, ক্রমিক সংখ্যা-14

ও ঠাম্মা, — জানো বৃষ্টি হবে কবে?
মুচকি হেসে ঠাম্মা বলেন—
ঘ্যাঙর ঘ্যাঙ, ব্যাঙ ডাকবে যবে।
বলো না মা, থামবে কবে ঘামের স্নান?
মা-ও দেখি ঠাট্টা করেন—
চাতক পাখির মুখ-ও ম্লান।

যাকেই বলি বৃষ্টি-কথা,
সবার প্রাণেই কাতর ব্যথা,
তবুও আমি তাকিয়ে আকাশ পানে,
ভাবছি কেবল দিন-রাতি,
রিমঝিম সুর বাজবে ঠিকই কানে।
প্রকৃতি কি এতো নিষ্ঠুরতা জানে!

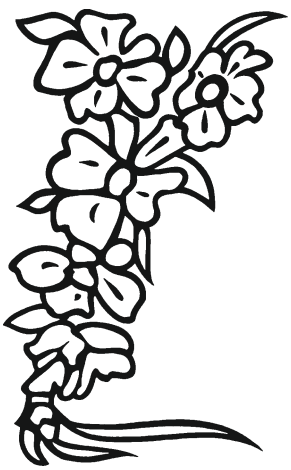

বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং শিক্ষাকর্মীবৃন্দ

1.	Dr. Dipankar Ghosh – M.Sc. (Chemistry), B.Ed., Ph.D.	–	Head Master
2.	Sri Goutam Bandyopadhyay – M.A. (Eng), B.Ed.,	–	Asst. Teacher
3.	Sri Sankha Roy – M.A. (Eng), B.Ed.,	–	Asst. Teacher
4.	Smt. Gopa Rani Das – M.A. (Geo), B.Ed.,	–	Asst. Teacher
5.	Sri Avik Kundu – M.A. (Beng), B.Ed.,	–	Asst. Teacher
6.	Smt. Anjana Barua Ghosh – B.Sc. (Bio), B.Ed., M.Sc.	–	Asst. Teacher
7.	Sri Prabir Paul – M.Sc. (Physics), B.Ed.,	–	Asst. Teacher
8.	Sri Subrata Mondal – M.A. (Beng), B.Ed.,	–	Asst. Teacher
9.	Sri Swapan Biswas – M.A. (Hist), B.Ed.,	–	Asst. Teacher
10.	Sri Sukanta Roy – M.A. (Eng), B.Ed.,	–	Asst. Teacher
11.	Smt. Sunita Saha – M.A. (Education), B.Ed.,	–	Asst. Teacher
12.	Dr. Nabyendu Paramanik – M.Sc. (Chem), B.Ed., Ph.D.	–	Asst. Teacher
13.	Sri Somenath Sadhukhan – M.A. (Beng), B.Ed.,	–	Asst. Teacher
14.	Smt. Tumpa Kundu – M.A. (Pol. Sc.), B.Ed.,	–	Asst. Teacher
15.	Sri Pashupati Pal – M.A. (Hist), B.Ed.,	–	Asst. Teacher
16.	Sri Swarup Ujjal Mangal – M.Sc. (Bio-Chem), B.Ed.,	–	Asst. Teacher
17.	Smt. Ranjita Chakraborty – B.A., B.Ed., M.A. (Hist)	–	Asst. Teacher
18.	Smt. (Dr.) Rajasree Banerjee – M.Sc. (Econ.), B.Ed, Ph.D.	–	Asst. Teacher
19.	Smt. Piyali Mondal – M.Sc. (Comp. Sc.), B.Ed.,	–	Asst. Teacher
20.	Sri Biswajit Chowdhury – M.Sc. (Math), B.Ed.,	–	Asst. Teacher
21.	Smt. Shibani Roy Banerjee – M.,A. (Geo), B.Ed.,	–	Asst. Teacher
22.	Smt. Jaba Ghosh – M.Sc. (Botany), B.Ed.,	–	Asst. Teacher
23.	Smt. Kaberi Podder – M.As. (English), B.Ed.,	–	Asst. Teacher
24.	Sri Ujjwal Kumar Nandi – M.Sc. (Math), B.Ed.,	–	Asst. Teacher
25.	Smt. Mithu Roy – M.A. (English), B.Ed.,	–	Asst. Teacher
26.	Sri, Subrata Hazra – M.Sc. (Physics), B.Ed.,	–	Asst. Teacher
27.	Smt. Malabika Biswas – M.Sc., (Zoology), B.Ed.,	–	Asst. Teacher
28.	Sri Pritam Banerjee — M.A. (Geo), B.Ed.,	–	Asst. Teacher
29.	Sushrita Saha, M.A. (Evs.) & Computer	–	Asst. Teacher

বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষক—

1.	Shalinee Das	Health Care

বিদ্যালয়ের শিক্ষকতার কাজে যুক্ত অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ

1.	Anirban Saha – M.C.A.	Computer Teacher
2.	Trisha Chatterjee	Nutrition Teacher
3.	Swagata Chatterjee	Sociology Teacher
4.	Joymalya Paul	Commerce Teacher
5.	Sharmita Karmakar	Recitation Teacher
6.	Koushik Das	Drawing & Physical Education – Teacher

এছাড়াও যারা বিদ্যালয়ে অন্যান্য কাজে যুক্ত রয়েছেন—

1.	Paritosh Bonik	Office Staff
2.	Suman Gupta	Office Staff
3.	Chaina Ghosh	Office Attendent
4.	Krishna Mondal	Mid-day-meal (C.C.H.)
5.	Lakshmi Ghosh	Mid-day-meal (C.C.H.)
6.	Balai Ghosh	Mid-day-meal (C.C.H.)
7.	Payel Basak	Mid-day-meal (C.C.H.)
8.	Tumpa Ghosh	Mid-day-meal (C.C.H.)
9.	Saraswati Mondal	Mid-day-meal (C.C.H.)

**TEACHING & NON TEACHING STAFF OF
SINTHI RAMAKRISHNA SANGHA VIDYAMANDIR
2026**

SINTHI RAMAKRISHNA SANGHA VIDYAMANDIR
ESTD-1959
(Govt. Sponsored)
76B, KALICHARAN GHOSH ROAD, KOLKATA-700050
HIGHER SECONDARY &
Primary- Unit-I, Unit-II
SINTHI RAMAKRISHNA SANGHA
সিঁথি রাম কৃষ্ণ সঙ্ঘ
বিদ্যা মন্দির
স্থাপিত ১৯৫৯
TANTRI ART SCHOOL